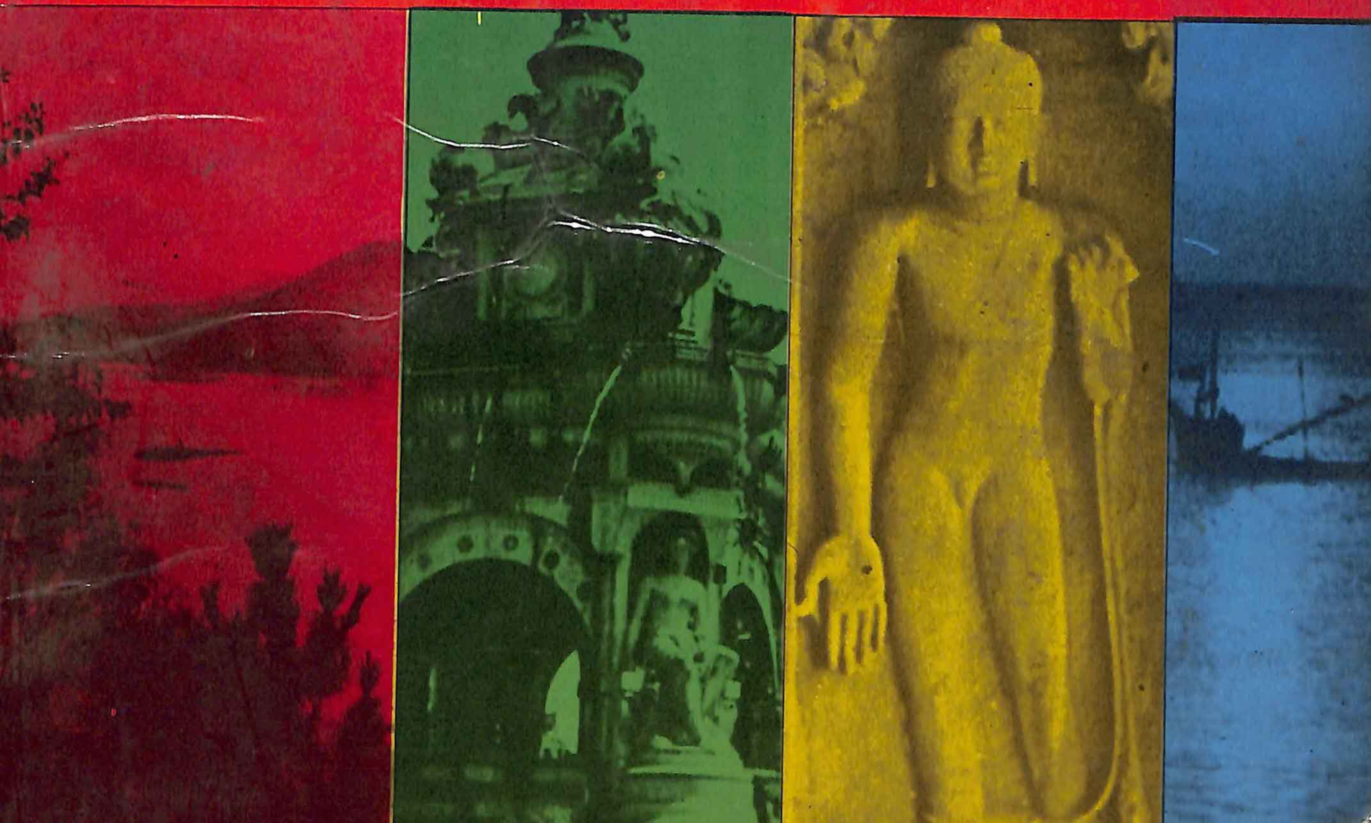
সুবোধকুমার চক্রবর্তী

ছোটদের রম্যাণি বীক্ষ্য

ভারত



ছোটদের রম্যাণি বীক্ষ্য



৪·৪
৯৫৮

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

ছোটদের রম্যাণি বীক্ষ্য

ভারত

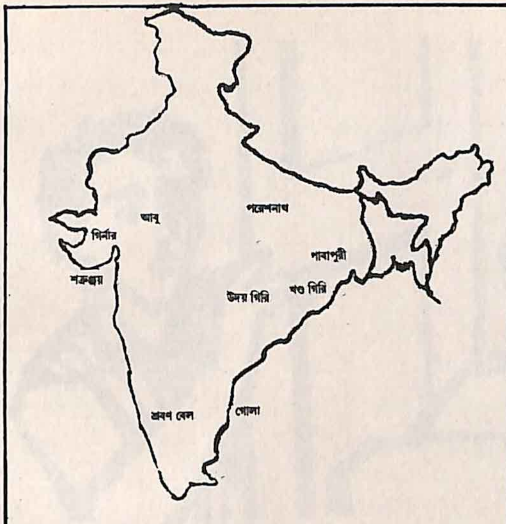
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৮৬

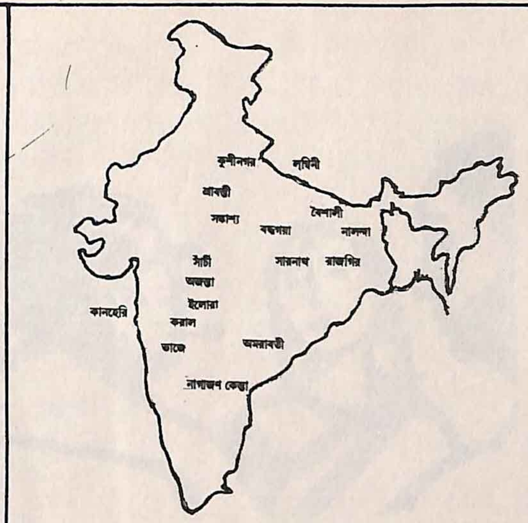
প্রকাশক
রাজীব নিয়োগী
এ· মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
প্রচ্ছদ
পুণ্যব্রত পত্রী
অঙ্গসজ্জা
সুব্রত চৌধুরী

ফোটোটাইপ সেটিং
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
৭ জওহরলাল নেহেরু রোড়
কলকাতা-৭০০ ০১৩
মুদ্রক
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২ রামমোহন সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দশ টাকা



জৈন তীর্থ



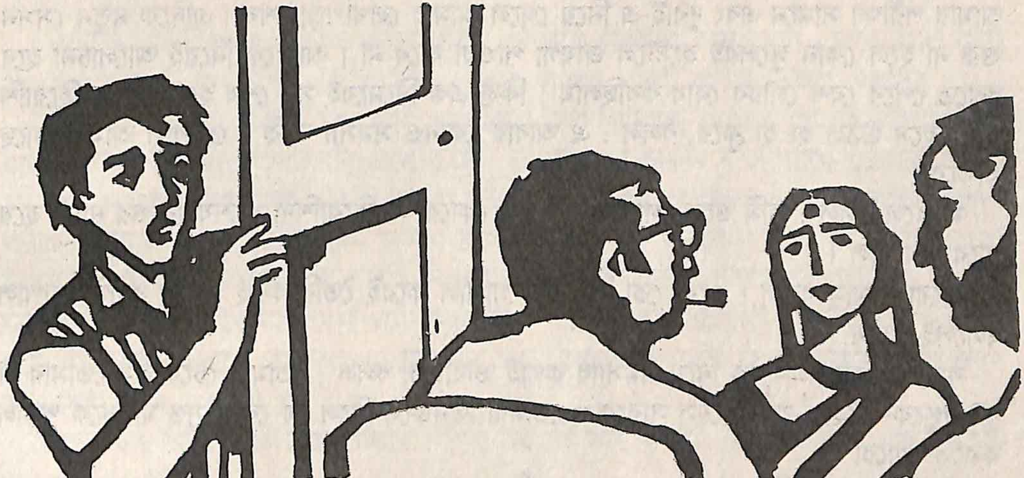
বৌদ্ধতীর্থ



জম্বুদ্বীপ

পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা





খেলার সময় খেয়াল ছিল না, বেশ একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই বাড়ি ফিরে পা টিপে টিপে দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ির আবহাওয়া যেন থমথম করছিল, কোন সাড়াশব্দ নেই। বাড়িতে কি কেউ নেই! সাহসে ভর করে বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। মা বলল, মুখ হাত ধুয়ে এসো।

চুপচাপ চলে যাবার সময়ে আড়চোখে দেখলাম, বাবা সোফায় বসে গম্ভীর মুখে পাইপ টানছে। আমাকে যেন দেখেও দেখল না। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা আজ অন্য রকম। একটা বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ইচ্ছে করেই বাথরুমে দেরি করছিলাম, আর মনে মনে সাহস সঞ্চয় করছিলাম। এমন সময়ে আর একবার বেল বাজল। দরজা খোলার শব্দ হল। মা বলল, এসো হিরোশিদা, তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি।

সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা জেনে নিলাম। বাবাকে দিল্লী ছেড়ে যেতে হচ্ছে দুবাই-এ, মা সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরেছে। সমস্যা আমাকে নিয়েই, কারণ

আমার পরীক্ষা সামনে এবং দুবাই-এ নিয়ে গেলে আমার লেখাপড়া শেষ। এদিকে নতুন সেসন শুরু না হলে কোন স্কুলেরই হস্টেলে জায়গা পাওয়া যাবে না। আমাকে নিয়েই আলোচনা হবে বুঝতে পেরে বেশ গৌরব বোধ করছিলাম। কিন্তু এক নিমেষেই সব শেষ হয়ে গেল। হিরোশি মামু হেসে উঠল হা হা করে, বলল : এ আবার কোনও সমস্যা নাকি ! গোপাল আমার কাছে থাকবে।

মা বলে উঠল : তুমি ওকে গোপাল গোপাল কোরো না হিরোশিদা ; শেষটায় ওর নামই হয়ে যাবে গোপাল।

হিরোশি মামু বলল : ওকে তো আহ্লাদে গোপাল করেই তৈরি করছ। আর আমি গোপাল বললেই দোষ !

বাবা বোধহয় আমাকে নিয়ে সমস্যার কথাই ভাবছিল, বলল : তোমার চেয়ে ভয় তোমার ঐ দুই বন্ধুকে—হৈচৈ আর ইয়েস সারকে। তোমরা তিনজনে মিলে যে কোন সুস্থ মানুষকে পাগল করতে পারো।

হিরোশি মামু গম্ভীর হয়ে বলল : তা পারি। আবার কোন বাপ মায়ে একটা সুস্থ ছেলেকে পাগল করে তুলছে দেখলে তাকে মানুষ করতেও পারি। মানে পুরনো যুগটাকেই যারা আঁকড়ে ধরে আছে। তারা এ যুগের ছেলেমেয়েকে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ দেবে না। ওদের ছেড়ে দাও, দেখতে দাও দেশটাকে, দেশের মানুষকে। তারপর পৃথিবীর যে কোন ময়দানে ওরা লাঠির খেলা দেখাতে পারবে। হপ্তা কয়েক পরে আমরা ভারত দর্শনে বেরোচ্ছি। গোপাল আমাদের সঙ্গে গেলে সে মানুষ হয়ে ফিরতে পারবে।

হিরোশি মামুর কথায় মনটা দুলে উঠল। কিন্তু বাবা বলল : তোমাদের সঙ্গে ভারত দর্শনে বেরোলে তো ওর চলবে না, ওকে তো ফাইনাল পরীক্ষাটা দিয়ে ক্লাসের প্রোমোশন নিতে হবে।

হিরোশি মামু বলল : তার জন্যে আমরা না হয় যাত্রাটা কয়েক দিন পিছিয়ে দেব।

এবারে মা বলল : মাসির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। মাসিও তোমাদের ভয় পায়।

তবে আমাকে ডেকেছ কেন ?

বলে হিরোশি মামু উঠবার চেষ্টা করতেই মা তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দিল। বলল : রাগ করছ

কেন ? তুমি ছাড়া দিল্লীতে আমাদের আর কে আছে ? কার কাছেই বা আমরা সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারি ।

হিরোশি মামু উঠবার ভাণ করেছিল মাত্র। এইবারে জাঁকিয়ে বসে বলল : তবে একটু কফি খাওয়াও, আর গোপালকে ডেকে দাও। তার সঙ্গেও একটু পরামর্শ করা দরকার।

সাহস করে আমি এবারে ঘরে ঢুকে পড়লাম। আর আমাকে দেখতে পেয়েই হিরোশি মামু বলে উঠল : এই যে গোপালবাবু এসে গেছ। বোসো, খুব জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বলে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে আমার পরীক্ষার তারিখগুলো জেনে নিল। তারপর বলল : পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তুমি আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, তোমার হৈচৈ চাচা ও ইয়েস সার আঙ্কেলের সঙ্গেও না। তুমি নিজের ঘরে বসে পড়বে, মাস্টারমশাই তোমাকে পড়াতে আসবেন, আর দিদা তোমার দেখাশুনো করবেন। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট্ হলে তুমিও আমাদের সঙ্গে ভারত দর্শনে যাবে, তার আগে রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষার সময়ে সেল্ফ্ হেল্পের ট্রেনিং নেবে আমাদের কাছে। রাজী ?

এক কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু হিরোশি মামু বলল : কিন্তু তোমার ওপরে একটা বড় দায়িত্ব থাকবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : কী ?

গোপাল নাম শুনেছ ? বিদ্যাসাগর মশায়ের গোপাল নয়, 'রম্যাণি বীক্ষ্য'র গোপাল ?

বললাম : না।

হিরোশি মামু বলল : গোপাল নামে একজন চব্বিশটা খণ্ডে ভারত দর্শনের কথা লিখেছে। কিন্তু কাজের কথা কিছুই লেখে নি। তোমাকে ছোটদের জন্যে 'রম্যাণি বীক্ষ্য' লিখতে হবে। একেবারে নতুন কায়দায়, নতুন যুগের উপযোগী করে ভারত দর্শনের কথা। তুমি খাতা পেন্সিল কাগজ কলম রঙ তুলি যা দরকার সব সঙ্গে নেবে। দিল্লী থেকে আমরা মোটরে বেরোব। উত্তর ভারতে আমাদের ন্যাভিগেটর হবে তোমার হৈচৈ চাচা, আর দক্ষিণ ভারতে তোমার ইয়েস সার আঙ্কল্। তুমি নোট নেবে ইন্টারেস্টিং জায়গার, মেটিরিয়াল সংগ্রহ করবে, ছবি ম্যাপ স্কেচ আঁকবে। বই ছাপার ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু সাবধান, তোমার বয়সী ছেলেমেয়েরা যেন

তোমার লেখা 'ছোটদের রম্যাণি বীক্ষ্য' পড়বার জন্যে কাড়াকাড়ি করে। আমরা তিনজনেই তোমাকে সাহায্য করব, দরকার হলে অন্যের সাহায্যও নেব। আজকের সব কথাও নোট করে রাখো। এর পরের লেখা হবে পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন থেকে। গুড নাইট।

হিরোশি মামুর কথা না মেনে উপায় ছিল না। বাবা মাকেও তাঁর কথা মানতে হয়েছে। আমাকে তাঁর কাছে রেখেই তাঁরা দুবাই গেছেন। মামুর সতর্ক প্রহরায় আমি পরীক্ষা দিয়েছি। ভৌ সারাদিন আমার সামনে বসে থাকত, কাউকে কাছে আসতে দিত না। পরীক্ষা শেষ হবার পর মামু আমাকে খাতা পেন্সিল দিয়ে বলল : কাল সকাল থেকেই তোমার সেল্ফ্ হেল্পের ট্রেনিং। আমার বিশেষ কাজ আছে। তুমি নিজের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নিজে করবে। ভৌ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তার কাছে সাহায্য নিও।

ভৌ হিরোশি মামুর প্রিয় কুকুর। একদিন রাস্তায় তার গাড়ির তলায় প্রায় চাপা পড়েছিল। কেঁউ-কেঁউ করতে করতে বেরিয়ে এসেছিল। বেড়ালের মতো সাদা একটা কুকুরের বাচ্চা। হিরোশি মামু সেটাকে কুড়িয়ে বাড়ি এনে বড় করেছে। এখন ভৌ ভৌ করে ভয় দেখায় সবাইকে। এই কদিনেই আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। সকাল বেলায় হিরোশি মামুর সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খেল। নিচে গিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলে বললাম : চল, এবারে আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

হৈচৈ চাচা ও ইয়েস সার আঙ্কল একই বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটে থাকে। প্রথমে ইয়েস সার আঙ্কল-এর ফ্ল্যাটের দিকে যাচ্ছি দেখে ভৌ বারণ করল, কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি তার কথা বুঝতে না পেরে দরজার সামনে থেকে ফিরে এলাম। ভৌ বেল বাজাতেও বারণ করেছিল। ইয়েস সার আঙ্কলের পূজো পাঠ শেষ হয় নি বলে দরজা খুলে দেবার কেউ নেই। এ কথা জানতে পারলাম হৈচৈ চাচার কাছে। ভৌ নিচের তলায় তার কাছে আমাকে নিয়ে এসেছিল। তাঁর কাণ্ড দেখে আমার চক্ষু স্থির। দু তিনটে লোক নিয়ে হৈচৈ চাচা তাঁর ছোট গাড়িটা খুলে ফেলেছে। সমস্ত যন্ত্রপাতি খোলা এবং হৈচৈ চাচা সেই লোকদের কাছে অনেক কিছু জেনে নিচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল : জল্দি আ যাও বেটা, তুমভি সব সমঝ্



লেও।

জিজ্ঞেস করলাম : কী বুঝে নিতে হবে চাচা ?

হৈচৈ চাচা বলল : পথে এই গাড়ি বেগড়ালে আমাদেরই রোগ সারাতে হবে তো ! মিস্ত্রির খোঁজে সময় নষ্ট করলে চলবে না। নিজেদের জন্যে যেমন ফার্স্ট এড বক্স রাখতে হয়, তেমনি গাড়িরও ফার্স্ট এডের দরকার হতে পারে—মেকানিকাল ইলেকট্রিকাল দুইই। কলকব্জা সব হাতে-কলমে দেখে শিখে নাও।

গাড়িটা ফিট করতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। ক্ষিধেয় পেট চুঁইচুঁই করতে লাগল। কিন্তু ছুটি নেই। নিজের হাতে সব ফিট করতে হল। নাম জেনে রাখতে হল সব কলকব্জার। তারপর হৈচৈ চাচা আমাদের টেনে নিয়ে গেল তার নিজের ফ্ল্যাটে। দুপুরের লাঞ্চ একসঙ্গে। বললাম : দিদাকে বলে আসি নি যে !

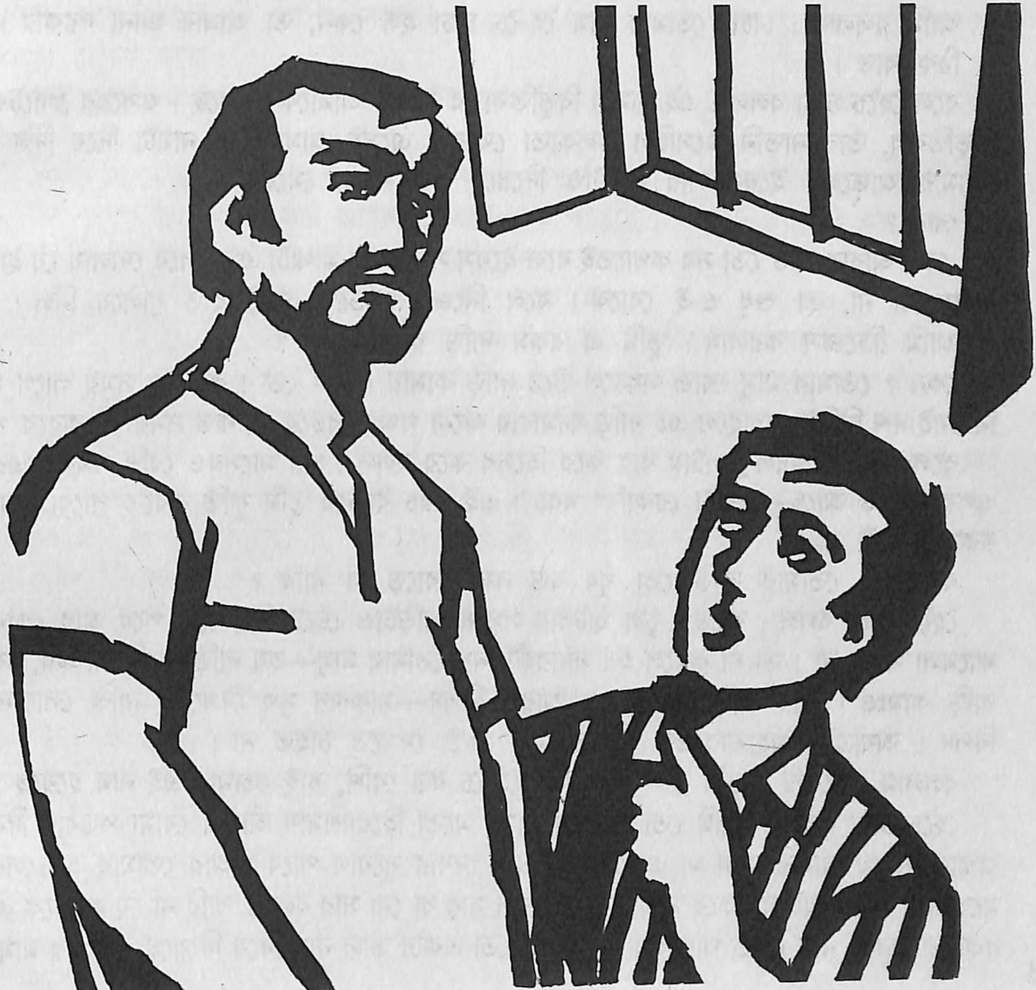
টেলিফোন আছে। বলে চাচা নিজেই দিদাকে জানিয়ে দিল। দিদা বললেন : ভৌ এসে জানিয়ে গেছে।

সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আমরা খেতে বসলাম। হৈচৈ চাচা বলল : এই শরীরটা ঠিক মোটরের ইঞ্জিনের মতো। যতটুকু খাবার দরকার ততটুকুই দিতে হবে। বেশি নয়, কমও নয়। বেশি খেলে শুধু খাদ্যের অপচয় নয়, তা হজম করবার জন্যে শ্রমেরও অপব্যয়। আমার ওজন পঞ্চান্ন কিলোগ্রাম, বেশি পরিশ্রম করতে হয় না বলে আমার খাদ্যে দু হাজার আটশো কিলো ক্যালোরিই যথেষ্ট। পঞ্চান্ন গ্রাম প্রোটিন অর্থাৎ এক পিস মাছ বা মাংসেই আমি তা পেয়ে যাব। তোমার ওজন যদি পঁয়তাল্লিশ কিলোগ্রাম হয় তবে তোমার পঁয়তাল্লিশ গ্রাম প্রোটিন চাই। মাছ মাংস ডিম দুধ ছানা এমনকি ডালেও তুমি এই প্রোটিন পাবে। আর যে সব ভিটামিন ও মিনারেল দরকার, তা শাক সব্জি থেকে সহজেই পেয়ে যাবে। মনে রাখবে যে খাবার জন্যে জীবন নয়, জীবনের জন্যে খাবার।

খেতে খেতেই হৈচৈ চাচা বলল : এই যে আমার শরীরটা দেখছ, এ থেকে কী পাওয়া যেতে পারে জানো ? যার ওজন আমার চেয়ে ন-দশ কেজি বেশি, তার শরীরের চর্বি দিয়ে সাত কেক সাবান হতে পারে। শরীরের চিনি দিয়ে কফি হবে মাত্র তিন কাপ, আর লোহা দিয়ে দুটো পেরেক এক ইঞ্চিরও কম লম্বা। তবে শরীরের কার্বনকে গ্রাফাইটে পরিণত করলে ন হাজার পেনসিলের শিস পাবে, ক্যালসিয়াম দিয়ে ছোট একটা হাঁস বা মুরগির ঘর চুনকাম করতে পারবে, আর ফসফরাস দিয়ে দু হাজার দুশো দেশলাই-এর কাঠি তৈরি হবে।

হৈচৈ চাচা একটু থেমে বলল : আরও একটা কাজ পারবে। এই শরীরের হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস দিয়ে পাঁচশো গজ পথে দু ঘণ্টা আলো দিতে পারবে। কিন্তু এসব কথার কথা। মরে গেলেই সব শেষ। আমাকে কবর দেবে, ইয়েস সারকে জ্বালিয়ে দেবে। যদি কিছু রেখে যেতে পারো, তাই থাকবে। তোমার কীর্তি। হিরোশি ঠিক বোল্‌তা হায় বেটা, তুমে জিন্দা রহনা হায়। শুধু খেয়ে বেঁচে থাকা নয়, মানুষকে কিছু দিয়ে মানুষের মনে বেঁচে থাকতে হবে।

খাবার পরেও হৈচৈ চাচা আমাকে ছেড়ে দিল না। বলল : রবিবার থেকে আমাদের ভারত দর্শন, প্রথমে দিল্লী ও আশপাশের জায়গা, তারপর সারা ভারত। তোমার রেজাল্ট বেরোতে দেরি হলে একবার ফিরে আসতে হবে দিল্লীতে, তোমার বাবা-মাকে তোমার রেজাল্ট জানাবার পর আমাদের ছুটি। এই সময়ের মধ্যেই তোমাকে সব খবর সংগ্রহ করে নিতে হবে।



আমি বললাম : চাচা, তোমার নাম হৈ-চৈ চাচা হল কেন, তা আমার জানা দরকার। ঠিক বাত।

বলে হৈচৈ চাচা বলল : এই নামটা বিভূতিবাবুর নাতনি আমাকে দিয়েছে। ওপরের ফ্ল্যাটের বিভূতিবাবু, তাঁর নাতনি এসেছিল কলকাতা থেকে। এসেই আমার এই নামটা দিয়ে দিল। তোমার আঙ্কলের ইয়েস সার নামটাও দিয়েছে সেই বাচ্চা মেয়েটা।

কেন ?

কেন আবার ? ও তো সব কথাতেই বলে ইয়েস সার, আর মাথাটা এমনভাবে দোলায় যে হ্যাঁ বলছে না না, তা শুধু ও-ই বোঝে। বলে নিজের দাড়িতে একটু হাত বুলিয়ে নিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : তুমি এ রকম দাড়ি রাখো কেন ?

কেন ? তোমার মামু রোজ সকালে উঠে দাড়ি কামায়। ঠিক তো ! কতক্ষণ সময় লাগে ? নিশ্চয়ই দশ মিনিট। তাহলে এই দাড়ি কামাবার জন্যে পঞ্চাশ বছরে সে কত সময় নষ্ট করবে ?

বলেই একটা ক্যালকুলেটার বার করে হিসেব করে বলল : চার মাসেরও বেশি সময়। এর ওপর খরচও আছে—একটা রেকারিং খরচ। এই খরচ বাঁচিয়ে তুমি ফূর্তি করতে পারো অন্য রকম। তাই না ?

বললাম : তোমার দাড়ি তো খুব বড় নয় ! বাড়ে না নাকি ?

হৈচৈ চাচা বলল : বাড়ে। চুল ছাঁটবার সময়ে দাড়িটাও ছেঁটে নিই বলে পরে আর কোন ঝামেলা থাকে না। তা না করলে হয় সর্দারজী, নয় তোমার মামু—হয় দাড়ির পরিচর্যা কর, নয় দাড়ি কামাও। আর দাড়ি না গজালে আরও বিপদ—মাকুন্দর মুখ দেখলেই নাকি লোকের বিপদ। অযাত্রা। মহাভারতের ভীমের মুখ কেউ দেখতে চাইত না।

বললাম : বুঝেছি। তুমি কাজ কম করে হৈ চৈ কর বেশি, তাই তোমার এই নাম হয়েছে।

হৈচৈ চাচা বলল : আমি তো তোমার মামুর মতো হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা পড়বার দিন জন্মায় নি যে আমার বাবা মা একটা ভাল নাম দেবার সুযোগ পাবে ! আর তোমার আঙ্কলের মতো সব কথায় ঘট ঘট করে মাথা নেড়ে ইয়েস সার বা নো সার বলতে পারি না যে আমাকে ঐ রকমের একটা নাম দিতে পারবে। তোমারও তো একটা ভাল নাম দিয়ে দিয়েছে, তোমার মামু,

এখন থেকে তোমার ঐ গোপাল নামটাই চালু হয়ে যাবে। মগর ইয়াদ রাখ্না, হিন্দোস্তানকো আগে বাঢ়ানা হ্যায়।

ভৌ লেজ নাড়তে নাড়তে দরজার বাইরে চলে গিয়েছিল, ভৌ ভৌ করে অভ্যর্থনা করেছিল কাউকে।

সহসা ইয়েস সার আঙ্কলের কণ্ঠস্বর শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং তাকিয়ে দেখলাম যে খোলা দরজা দিয়ে ইয়েস সার আঙ্কল ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বলল : নো মাই বয়, আওয়ার ল্যাণ্ড ইজ ভারত—ইণ্ডিয়া, নট ইওর হিন্দোস্তান।

হৈচৈ চাচা বলে উঠল : হিন্দোস্তান ভি হামারা হ্যায়।

ইয়েস সার আঙ্কল তাঁর মুখ বিকৃত করে বলল : ভারতকে হিন্দোস্তান বলে তোমরা অন্যায় করছ। যে দেশে সব ধর্মের সব জাতের মানুষের সমান অধিকার বসবাসের, তাকে হিন্দোস্তান বলে তোমরা দেশের অসম্মান করছ। এ নাম তো ভারতবাসীর দেওয়া নাম নয়, এ নাম দিয়েছে বিদেশবাসী। তারা এই দেশ আক্রমণ করতে এসে বাধা পেয়েছে সিন্ধু নদের কাছে। সিন্ধুকেই তারা বলেছে হিন্দু, দেশবাসীকেও হিন্দু বলেছে। দেশের সনাতন ধর্মেরও নাম হয়েছে হিন্দু ধর্ম। হিন্দুর দেশ বলেই হিন্দোস্তান। আর হিন্দ্ থেকেই ইণ্ডিয়া নাম হয়েছে। কিন্তু ভারত ? ভারত আমাদের নিজেদের দেওয়া নাম।

ইয়েস সার আঙ্কল একখানা চেয়ারে বসে হৈচৈ চাচাকে বলল : কফি !

হৈচৈ চাচা উঠে যেতেই আমাকে বলল : খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছ হাজার বছর আগের কথা বলছি তোমাকে। তখনকার লোকে জানত যে পৃথিবীতে সাতটা দ্বীপ আছে। আর তা সাত সমুদ্রে ঘেরা। তাই বলত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। আজ যার নাম এশিয়া ও ইউরোপ তারই নাম ছিল জম্বু দ্বীপ। প্রথম রাজা মনুর নামে আমাদের নাম মানব বা মানুষ হয়েছে। মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত তাঁর সাত ছেলেকে সাতটি দ্বীপ দিয়েছিলেন, জম্বু দ্বীপ পড়েছিল বড় ছেলে অগ্নীধ্রর ভাগে। ইনি আবার জম্বু দ্বীপকে ন ভাগ করে তাঁর নয় ছেলেকে দিয়ে যান। হিমালয়ের দক্ষিণে হিমবর্ষ পড়ল বড় ছেলে নাভির ভাগে। নাভির ছেলে ঋষভ, আর ঋষভের বড় ছেলে ভরতের নামে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। বিদেশীদের কথায় কি আমরা এই পুরনো নামটা বাতিল করে

দেব ! হিন্দোস্তান শব্দের মধ্যে একটা ধর্মের গন্ধ আছে। যে ধর্ম এক দিন পৃথিবীর সনাতন ধর্ম ছিল, সেই ধর্মের নাম হিন্দু ধর্ম দিয়েছে বিদেশীরা। মানুষের ধর্ম একটাই, মানুষের কল্যাণ যাতে হয় তারই নাম ধর্ম। ধর্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাই জীবনে সত্য ভ্রষ্ট হতে নেই।

রান্নাঘর থেকে হৈচৈ চাচা বলল : আমি আসছি ইয়েস সার, গোপালকে তুমি ভয় দেখিও না।

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : হৈচৈ আসবার আগেই তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। এ দেশে মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মও আলাদা ছিল না। ভরতের বাবা ঋষভ যে ধর্মের কথা বলেছিলেন, মহাবীরের পর তারই নাম হয়েছে জৈন ধর্ম। আর বুদ্ধ তো মহাবীরের সমসাময়িক, এঁরা সনাতন ধর্মেরই নতুন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মতকে ধর্ম না বলে দর্শন বললেই ভাল হত—ষড়্ দর্শনের পর আরও দুটো দার্শনিক মত। দর্শন হল ফিলজফি। বড় হয়ে তোমরা ফিলজফি পড়বে।

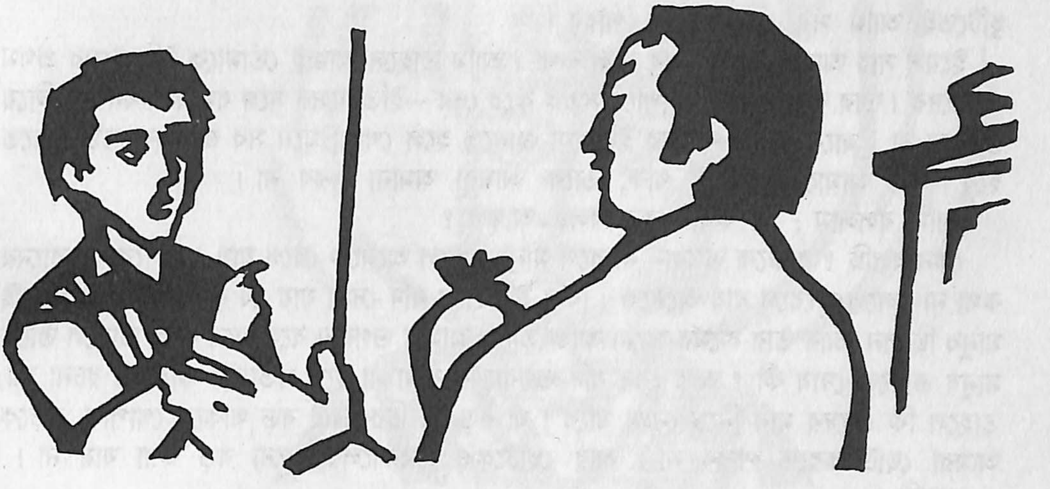
হৈচৈ চাচা এল কফির ট্রে নিয়ে।

হৈচৈ চাচার পায়ের কাছে বসে ছিল ভৌ। হৈচৈ চাচা তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল : কফি খাবি, না বিস্কুট ?

ভৌ তার জিভ না দেখিয়ে দাঁত দেখাতেই হৈচৈ চাচা একটা বিস্কুট দিল তাকে।

কফি খেতে খেতে ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : তোমাকে তো এবারে বেরোতে হবে। আমি গোপালকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

হিরোশি মামুর কাছে শুনেছি, হৈচৈ চাচা কাজ করে খবরের কাগজের অফিসে। বিকেলের দিকে অফিসে যায়, আর ফেরে অনেক রাতে। ইয়েস সার আঙ্কলের কাজটা মজার। একটা কলেজে পড়ায়। যেতে হয় এক একদিন এক এক সময়ে। যাবার আসবার সময়ের কোন ঠিক নেই। হিরোশি মামুরই কষ্ট বেশি। সকাল বেলায় কোন রকমে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে যায়, ফেরে সন্ধ্যেবেলায়। মাঝে মাঝে দিল্লীর বাইরেও যেতে হয়—কলকাতা বম্বে ম্যাড্রাস হায়দ্রাবাদ, আরও কত জায়গা। প্লেনে গিয়ে প্লেনেই ফিরে আসে। কী একটা ফার্মের কাজ। মামু বলে, সরকারী কাজ হলে এত খাটতে হত না। বেসরকারী মালিক বেশি পয়সা দিয়ে খাটিয়েও নেয়



বেশি, ভয়ও দেখায় নানা ভাবে। মামু আমাকে বলে, তোমার বাবা দুবাই থেকে বস্তা ভরে টাকা আনবে। কিন্তু তুমি টাকার পিছনে ছুটো না। ছুটো নামের জন্যে। দেশজোড়া নাম। টাকা দিয়ে এ কালে রাজা হওয়া যায় না, এ কালের রাজা হতে হলে মানুষের মন জয় করতে হবে।

ভৌ বিস্কুট খেয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই ইয়েস সার আঙ্কল ঘড়ি দেখল, আর হৈচৈ চাচা বেরোবে বলে আমাকে তার ফ্ল্যাটে টেনে নিয়ে এল। বলল : গোপাল, এখন থেকে আমরা যা বলব, তোমাকে তা রোজ লিখে রাখতে হবে। যদি ভুলে যাও কিছু, তবে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। কয়েক দিন পরে আমরা ভারত দর্শনে বেরোব তো, তার আগেই তোমাকে ভারত সম্বন্ধে সব কথা জেনে নিতে হবে। শুধু ইতিহাস আর ভূগোল নয়, অনেক কথা জানবার আছে। এত বড় একটা দেশ, আর এত পুরনো দেশ যে জানবার কথার কোন শেষ নেই। একটা মানুষের জীবনে সব কথা জেনে শেষ করা যায় না। তাই তোমার মতো বয়স থেকেই জানবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যেতে হয়।

বললাম : আমার তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার হাতে অনেক সময়। এই

ছুটিতেই আমি সব জেনে নিতে পারব।

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : খুব ভাল কথা। আমি তাহলে আজই তোমাকে ইতিহাসের প্রথম পাঠ দেব। তার আগে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দেব—ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মকে কখনও মিলিয়ে ফেলবে না। মানে প্রাচীন কালের ইতিহাস জানতে হলে খোলা মনে সব জানবার চেষ্টা করতে হবে। ধর্ম আমাদের মাথায় থাক, তাকে আমরা অমান্য করব না।

আমি বললাম : এ কথা কেন বলছ আঙ্কল ?

কেন বলছি ? কৃষ্ণকে ভগবান না বলে মানুষ বললে অনেকে রেগে যায়। বেদকে ভগবানের কথা না বললেও রেগে যায় অনেকে। কিন্তু ইতিহাসে যদি দেখা যায় যে কৃষ্ণ আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, আর তাঁর কর্মের জন্যে আজ তাঁকে আমরা ভগবান বলে মনে করি, তাহলে তাঁকে মানুষ ভাবতে দোষ কী ? আর বেদ যদি ভগবানের কথা না হয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের রচনা হয়, তাহলে কি বেদের মান নিচে নেমে যাবে ! যা বড় তা চিরকালই বড় থাকবে গোপাল, বড়কে আমরা ছোট করতে পারব না। আর ছোটকেও চিরকালের জন্যে বড় করা যায় না।

বুঝেছি।

আমি এ কথা বলতেই ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : তাহলে ইতিহাসের কথা আরম্ভ করি। বাইবেলে ও পুরাণে আমরা একটা ভয়াবহ বন্যার কথা পাই। বাইবেল হল খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। আর পুরাণ আমাদের প্রাচীন কালের ইতিহাস, অনেকে ধর্মগ্রন্থই বলে। কিন্তু আমরা এই সব পুরাণের বই থেকেই এ দেশের ইতিহাসের কথা পাই। বাইবেলে আছে নোয়ার নৌকোর গল্প, আর পুরাণে মৎস্য অবতারের গল্প। এই গল্প থেকেই জানা যায় যে বন্যার জলে সমস্ত পৃথিবী যখন ডুবে যায়, তখন নৌকোয় করে কিছু রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। মানুষ পাহাড়ের গুহায় বা উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিল, আর বহু লোক দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতে গিয়ে উঠেছিল। দেশটা বহুদিন এই বন্যার জলের তলায় ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই জল নদী নালা দিয়ে সমুদ্রে চলে গেলে পৃথিবী আবার জেগে ওঠে, মানুষ পাহাড় থেকে নেমে পছন্দ মতো জায়গায় বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে এবং কোথায় কী পাওয়া যাবে তারও অনুসন্ধান করতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে যারা গিয়েছিল, তারা সেখানেই রয়ে গেল।



আমাদের পুরাণে আছে বিষ্ণুর নানা অবতারের গল্প—মৎস্য, বরাহ, কূর্ম প্রভৃতি অবতার। অর্থাৎ বন্যার জলে মৎস্য, কর্দমাক্ত পৃথিবীতে বরাহ, তারপর কূর্ম মানে কচ্ছপ যা জলে ও ডাঙায় সমান ভাবে চলে। বিষ্ণু বরাহের রূপ নিয়ে পৃথিবী উদ্ধার করবার পর কূর্ম রূপ নিয়ে সমুদ্র মন্থন করিয়েছিলেন। সোজা কথায় বিষ্ণু নামের কোন লোক বা রাজা পৃথিবীর কোথায় বাসোপযোগী জমি আছে তা খুঁজে বার করবার পর সবাই মিলে জলের নিচের সম্পদও খুঁজে বার করতে বেরিয়েছিলেন।

ইয়েস সার আঙ্কল্ বলে চলল : কিন্তু গোপাল, এ হল আমাদের পুরাণের কথা ও আমার ব্যাখ্যা। বিদেশীরা যে ইতিহাস লিখেছেন এবং এখনও মানেন, তাতে আমরা দেখি যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর তিন জায়গায় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল—মিশরে নীল নদের উপত্যকায়, ইরাকের ব্যাবিলন অঞ্চলে ও ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায়। এ ঘটনা পাঁচ হাজার বছর আগের বলে সবাই মেনে নিয়েছেন এবং মনে করেন যে আর্যরা এই সভ্যতা ধ্বংস করে ভারতে এসেছিল। সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদরো হরাপ্পা এবং গুজরাতের লোথাল প্রভৃতি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এই

সভ্যতার নিদর্শন এখন বার করা হচ্ছে। সম্প্রতি শুনছি যে দক্ষিণ আমেরিকাতেও সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, তার নাম মায়া সভ্যতা। কিন্তু তুমিই বল, আর্যরা যদি সিন্ধুর মানুষদের জয় করে থাকে তো সেখানকার ঘর বাড়ি মাটি চাপা পড়ল কেন ? আর মানুষগুলোই বা গেল কোথায় ?

আমি বললাম : ঠিক কথা।

ইয়েস সার আঙ্কল খুশি হয়ে বলল : আমার কী মনে হয় জানো ? আমার মনে হয় যে সেই পৃথিবীজোড়া ভয়ঙ্কর বন্যায় সব ডুবে গিয়েছিল। সেখানকার মানুষজন পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল পাহাড়ের গুহায়। আর মৎস্য অবতারের গল্প থেকে আমরা জানতে পারি যে দ্রাবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত নৌকোয় করে সৃষ্টি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর থেকেই বলা যায় না কি যে সত্যব্রত নামে কোন রাজা নৌকোয় করে দ্রাবিড় দেশ মানে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সিন্ধু সভ্যতাই এখন দ্রাবিড় সভ্যতা বলে পরিচিত হয়েছে ? এই প্রসঙ্গে তোমাকে আর একটা কথা বলব। বেলুচিস্তানে ব্রাহুই নামে একটা ভাষা আছে, পণ্ডিতরা একে দ্রাবিড় ভাষা বলেই মনে করেন। অর্থাৎ যারা ঐ অঞ্চলে থেকে যেতে পেরেছিল তারা দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাকে এখনও রক্ষা করে চলেছে সেখানে। এর মানে খুব স্পষ্ট—দ্রাবিড় ভাষা সিন্ধু উপত্যকারই ভাষা, সিন্ধু উপত্যকা থেকেই গেছে দক্ষিণ ভারতে।

ভৌ চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। একবার মিটমিট করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমি নীরবে শুনছি দেখে চোখ বুঁজল। ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : তুমি বলবে যে পণ্ডিতরা এ কথা মানবে কেন ? প্রমাণ দিতে হবে। দেব। পুরাণের হিসেবে মনুর পর এক হাজার বছরেরও কিছু বেশি দিন পরে তাঁর বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করেছেন এবং তারপর প্রায় এক হাজার বছর ছিল একটা অন্ধকার যুগ। তার মানে এই সময়ে বন্যায় সব ডুবে গিয়েছিল বলেই কিছু জানা যায় না। এরপর দক্ষের জন্ম এবং দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ বিগ্রহ। আমার মতে সিন্ধু সভ্যতা এই বন্যার জলেই ডুবে গিয়েছিল এবং বন্যার জল নেমে যাবার পরে আর্য জাতি ছোট ছোট দলে এই দেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তারা সিন্ধু উপত্যকার দ্রাবিড় জাতির সম্বন্ধে কিছু জানত না বলেই পুরাণে তাদের উল্লেখ নেই, বেদের ঋষিরাও কিছু জানতেন না। এরও অনেক পরে যখন বেদ রচনা আরম্ভ হয়, ঋষিরা তখন দেবতা ও দৈত্য দানবদের সম্বন্ধে প্রচলিত কথা শুনে লিখেছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ সব কত কালের পুরনো ঘটনা ?

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : পুরাণে সত্য যুগ দু হাজার বছরের । দেবতা ও অসুররা যুদ্ধ করেছে ত্রেতা যুগের প্রথম দিকে । তার মানে সিন্ধু সভ্যতা জলে ডুবে যায় ছ হাজার বছরেরও বেশি আগে । পৃথু রাজা তার আগে রাজত্ব করেছেন । তাঁর রাজ্যকে পৃথিবী বলত অর্থাৎ ভারতের বাইরেও তাঁর রাজত্ব ছিল বলে অনুমান করা উচিত । রাম রাজত্ব করেছেন চার হাজার বছর আগে এবং কৃষ্ণ সাড়ে তিন হাজার বছর আগের মানুষ ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : এই সময়ের হিসেব কী করে করলে আঙ্কল ?

এ একেবারে খাঁটি হিসেব গোপাল । তোমাকে বুঝিয়ে বলছি । মহাপদ্ম নন্দের কথা আমাদের ইতিহাসে আছে । ঐতিহাসিকেরা বলেন যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন খ্রীষ্টের জন্মের চারশো তের বছর আগে । আমাদের পঞ্জিকার শকাব্দ বঙ্গাব্দের মতো একটা কল্যব্দ আছে, তার থেকে বার করা যায় যে নন্দ সিংহাসনে বসেছিলেন খ্রীষ্টের জন্মের চারশো এক বছর আগে । বারো বছরের পার্থক্যটা এমন কিছু নয় । এইবারে পুরাণের হিসেবে নন্দের এক হাজার পনের বছর আগে পরীক্ষিতের জন্ম, তার মানে খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার চোদ্দশো ষোল বছর আগে । সেই বছর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, কৃষ্ণের বয়স তখন বিয়াল্লিশ বছর । তাঁর জন্ম মনুর সাড়ে চার হাজার বছর পরে । সোজা অঙ্ক । তুমি খুব সহজেই পেয়ে যাবে যে মনুর কাল প্রায় ছ হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ও কৃষ্ণের জন্ম ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে । সূর্য বংশ ও চন্দ্র বংশের রাজাদের সম্পূর্ণ বংশ লতা পুরাণে পাওয়া যায় । তাই দেখে তুমি যে কোন রাজার কাল অনুমান করে নিতে পারবে । কিন্তু এখন এ কাজ করার দরকার নেই । আমাদের দেশের পুরনো ইতিহাস বোঝবার জন্যে জেনে রাখতে হবে যে দেবতা দৈত্য ও দানবরা একজনেরই ছেলে, তাদের বাবা ছিলেন কশ্যপ, আর মায়েরা সবাই দক্ষের মেয়ে ছিলেন । অদিতির ছেলেরা আদিত্য বা দেবতা, দিতির ছেলেরা দৈত্য এবং দনুর ছেলেরা দানব । তাদের যুদ্ধ পারিবারিক বিরোধ, এ কালের মতো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নয় ।

এই সময়ে টেলিফোন বাজতেই ভৌ টেলিফোনের কাছে চলে গেল । ইয়েস সার আঙ্কলও উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল, বলল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোপাল এখানেই আছে । পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে ।

ভৌ ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু ইয়েস সার আঙ্ক্ল্ ফিরে এসে বলল : তোমায় হিরোশি মামু

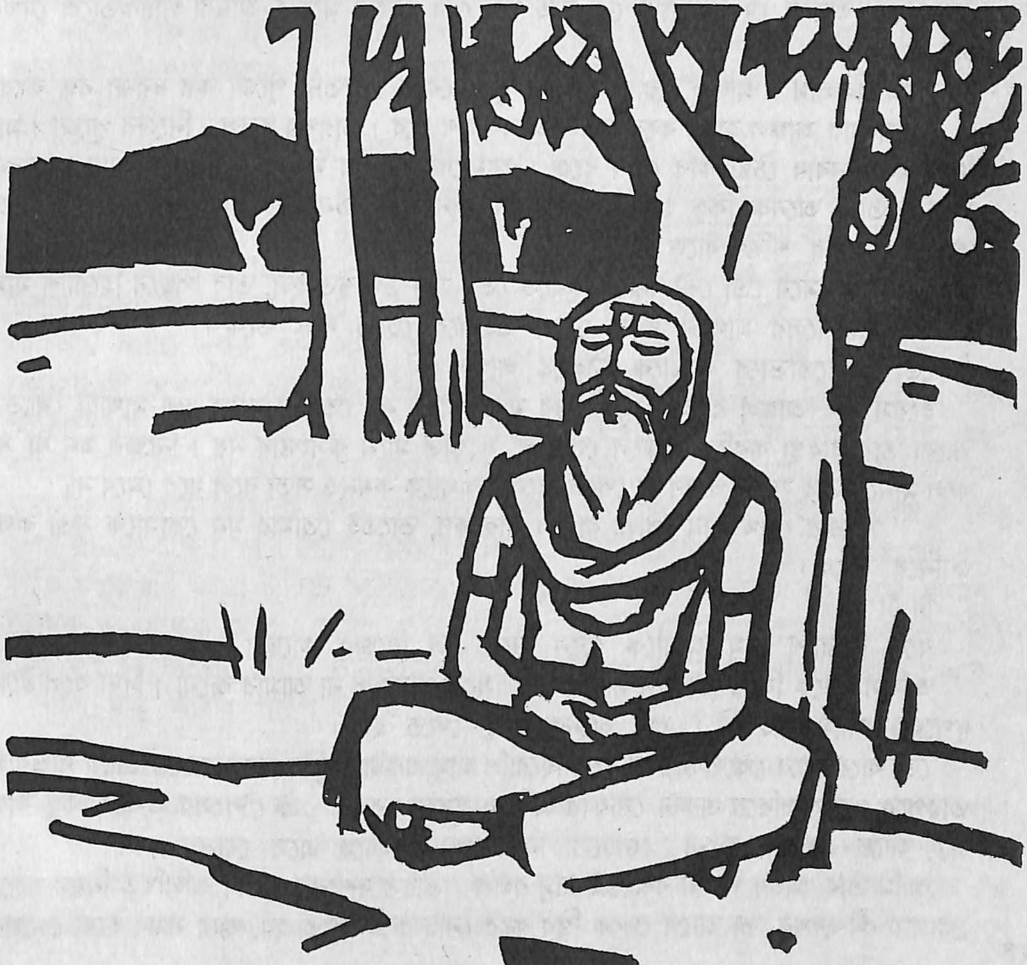
ডাকছে। তবে যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও গোপাল। তোমরা স্বর্গ মর্ত্য পাতালের নাম শুনেছ। সে সব পৃথিবীর বাইরে কোন জায়গা নয়। খুব মনোযোগ দিয়ে পুরাণ পড়লেই বুঝতে পারবে যে সেকালের স্বর্গ বা মেরু পর্বত ছিল ভারতের উত্তরে পামির নট্ অঞ্চলে। সেখান থেকে কোন গিরিপথ দিয়ে ভারতে আসা যেত। সে পথ যে দেবতারাই বন্ধ করে দেন সে কথা পুরাণেই আছে। আর পাতাল মাটির নিচে ছিল না, সমুদ্রের তীরকেই পাতাল বলত। আর মর্ত্য নাম ছিল এই ভারতেরই। দেবতাদের এক ভাই বিবস্বানের নাম হয়েছিল সূর্য। তাঁর ছেলের বংশ সূর্য বংশ, আর চন্দ্র বংশ তাঁর মেয়ের বংশ। তাঁরাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : দেবতারা যদি মানুষই ছিলেন, তবে আমরা তাঁদের পূজো করি কেন?

ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : মানুষের পূজো কি এখনও আমরা করি না? যাঁকে আমরা ভক্তি করি, তাঁর পূজোও করি। গুরুর পূজো করি না?

বললাম : তা করি।

তবে পূজোর নামে বাড়াবাড়ি বাড়ছে, সেটা ভাল নয়। আগে যজ্ঞ হত, দেবতারা যজ্ঞে আসতেন যজ্ঞের ভাগ নিতে। এই যজ্ঞ ছিল সেকালের উৎসব। বড় বড় পশু বলি দিয়ে রান্না হত, গান-বাজনা হত, নানা বিষয়ে আলোচনা হত। কয়েকটা দিন খুব আনন্দে কাটাবার ব্যবস্থা করা হত। রাজারা যজ্ঞ করতেন, নিমন্ত্রণ করতেন দেবতা ও ঋষিদের। সাধারণ লোকেও আসত। তারপর সবাই মিলে ফূর্তি চলত। এরই নাম যজ্ঞ। যখন দেবতারা রইলেন না, তখন তাঁদের নামে যজ্ঞের ভাগ দেওয়া হত আগুনে। যারা দেবতাদের দেখেন নি, অথচ তাঁদের সম্বন্ধে নানান গল্প শুনেছেন, তাঁরা কবিতা লিখতে লাগলেন। তার নাম হল মন্ত্র। কাহিনী লেখা হল তাঁদের কীর্তি নিয়ে। দৈত্য ও দানবরা কিছু খারাপ লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের খারাপ বলা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সব ধারনা গেল পালটে। বলবান বলে যাদের অসুর বলা হত, তারা হয়ে গেল খারাপ। শুধু স্বভাবে নয়, দেখতেও খারাপ। তারপর আমরা এমন সব গল্প রচনা করতে আরম্ভ করলাম যে দেবতারা সব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলেন, তাঁদের পূজোর বিধি তৈরি হতে লাগল। এখন অনেক দেবতাকেই আমরা ভগবান বলে ভাবছি। যিনি সৃষ্টি করেছেন,



তাঁকে তো আমরা দেখতে পাই নে, তাই সব দেব দেবীর মধ্যেই আমরা সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে চাই।

আমি বললাম : আঙ্কল্, রোজ সকালে তুমি কোন্ দেবতার পূজো কর দরজা বন্ধ করে ?

ইয়েস সার আঙ্কল হা হা করে হাসল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলল : নিজের পূজো। মানে নিজেকে জানবার চেষ্টা করি চোখ বুঁজে। আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা একে ধ্যান বলতেন। ধ্যানেই তাঁরা অনেক কিছু জানতে পারতেন। নিজেকে চিনতে পারাই সবচেয়ে বড় কাজ। তাতেই নিজের শক্তি বাড়ে।

ঠিক এই সময়ে ভৌ ভৌ করতে করতে ভৌ এসে উপস্থিত হল, তার পিছনে হিরোশি মামু। বলল : গোপালের মাথাটা খাচ্ছ তো! এইবারে ছেড়ে দাও ওকে।

ভৌ আলতোভাবে আমাকে ঠেলতে লাগল।

ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : আমি ওর মাথা খাচ্ছি না, তোমরা যাতে ওর মাথাটা খেতে না পারো তার ব্যবস্থা করছি। বুঝলে গোপাল, সংস্কৃতি মানে কুসংস্কার নয়। নিজের মন যা সত্য বলে মানবে তাই সত্য, প্রমাণ না পেলে অন্যের কথাকে কখনও সত্য বলে ধরে নেবে না।

নিজের চোখ কান খোলা রাখবে সারাক্ষণ, তাতেই তোমার মন তোমাকে সত্য কথাটা জানিয়ে দেবে।

টা-টা।

বলে হিরোশি মামু আমাকে টেনে নিয়ে এল নিজের কাছে।

অফিস থেকে ফিরে হিরোশি মামু খেতে বসতে পারছিল না আমার জন্যে। দিদা বলেছিলেন, দুপুরেও আমি খাই নি। তাই অনেক কিছু খেতে হল।

ভৌ বারে বারে খেতে চায় না বলে হিরোশি মামু একটা বিস্কুট ভেঙে ভেঙে তাকে খাওয়াল। তারপরে পাইপ ধরিয়ে একটা সোফায় এলিয়ে বসল। বলল : ঐ টেবলের ওপরে কিছু কাগজ পত্র আছে তোমার জন্যে। ওগুলো নিয়ে আমার কাছে এসে বোস।

আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করতেই মামু বলল : ভারত দর্শনের একটা অলিখিত নিয়ম আছে। কোথায় কী দেখব, তা আগে থেকে স্থির করে নোট করে নিতে হয়, আর সম্ভব হলে বেরোবার

আগে কিছু টুরিস্ট লিটারেচার সংগ্রহ করে পড়ে নিতে হয়। তাতে দুটো উপকার হয়—প্রথমটা হল নিজের পছন্দের জায়গার আশেপাশে আরও কিছু দেখবার আছে কিনা তা জেনে নেওয়া, আর দ্বিতীয়টা হল বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কী দেখবার আছে। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

এরপর মামু পাইপের ধোঁয়া নিল খানিকটা, তারপর বলল : মনে কর তুমি কর্ণাটক রাজ্যের বেলুরে চেন্নাকেশব মন্দিরের কারুকার্য খুব ভাল করে দেখে ফিরে এলে। তারপর শুনলে যে মন্দিরের গায়ে যে সব নর্তকীর মূর্তি ছিল তাদের হাতের বালা নাকি নাড়ানো যায়। তুমি না জেনে গিয়েছিল বলে দেখে আসো নি। তাই তোমাকে এ কথা মেনে নিতে হবে, আর আপশোষ না করে উপায় থাকবে না। অথবা বেলুর থেকে হালেবিডের মন্দির না দেখেই ফিরে এসে শুনলে যে তার কারুকার্য আরও সুন্দর, আর তখন আর সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। এই জন্যেই বলছি যে কোথায় কী দেখবে তা ভাল করে জেনে গেলে দেখা আরও ভাল হয়। তোমার হাতে এখন অনেক সময়। তাই এই ভারত দর্শনে তুমিই আমাদের গাইড হবে। তুমি যেখানে যেতে বলবে আমরা সেখানেই যাব, যা দেখতে বলবে আমরা তাই দেখব। ইয়েস সার তোমাকে ইতিহাসের কথা বলবে, হৈচৈ তোমাকে বলবে বর্তমানের কথা, আর আমি যে সব জায়গা দেখেছি বা কিছু জানি তা তোমাকে বলব। দেশের পথঘাট আমার মোটামুটি চেনা আছে, ম্যাপ আছে, গাইড বই আছে। তোমার জন্যে ট্যুরিস্ট লিটারেচার এনেছি, সব কথা নতুন নয়। তবু কাজে লাগবে। তোমরা এ কালের ছেলে। আমরা চেষ্টা করে যা জেনেছি, তোমরা জন্মেই তার অনেক কিছু জেনেছ। বয়সে ছোট হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তোমরা সহজেই আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

বলে মামু আবার পাইপ টানতে লাগল।

দিন কয়েকের চেষ্টায় আমি ভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেললাম। আঙ্কল্ বলেছিল, এই ভারত যে কত বড় দেশ সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। আমরা জানি যে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ভারতের সীমা। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে এই দেশ কত বড় ছিল তা মহাভারত পড়ে জানা যায়। পাণ্ডবরা দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে প্রথম যাত্রায় ব্রহ্ম শ্যাম চীন তিব্বত মঙ্গোলিয়া তাতার পারস্য প্রভৃতি জয় করে হীরাট কাবুল কান্দাহার হয়ে দেশে

ফিরেছিলেন। আর দ্বিতীয় যাত্রায় লঙ্কা থেকে আরব মিশর-জাঞ্জীবার ও আফ্রিকার নানা স্থান জয় করেন। ইংরেজ আমলেও উত্তরে সমগ্র কাশ্মীর, পূর্বে বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে পাকিস্তান ও দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ভারতের অন্তর্গত ছিল। খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট। কিন্তু আকারে ও জনসংখ্যায় ভারত এখনও একটি উপমহাদেশের মতো। বিশ্বের বড় দেশগুলির তালিকায় ভারতের স্থান সপ্তম। সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে ইউরোপের দুই তৃতীয়াংশ। হৈচৈ চাচার হিসেব মতো এ দেশের স্থল সীমান্ত ৯৪২৫ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চেয়েও বেশি। আর উপকূল রেখা ৩২০০ মাইল অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের প্রায় সমান। আমেরিকার লেখক মার্ক টোয়েন ভারতের সম্বন্ধে বলেছেন, the land of dreams and romance, a wonderland of fabulous wealth and fabulous poverty, of splendour and rags. আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও বলেছিলেন India is a bundle of centuries in which the cow and the tractor march together. ভারতে ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিশে আছে কঠিন দারিদ্র্য। এ দেশের পথে গরুর গাড়ি, আর আকাশে উপগ্রহ।

ইয়েস সার আঙ্কল আমাকে বলল : এ কোন নতুন কথা নয় গোপাল, পুরাকালেও এই রকমই ছিল। রামায়ণ তো পড়েছ ! রামায়ণেই আছে যে রাম বনবাসে যাত্রা করেছিলেন রথে চড়ে, গঙ্গা পেরিয়েছেন নৌকোয়, কিন্তু ভেলা তৈরি করে যমুনা পার হতে হয়েছিল, আর হেঁটে যেতে হয়েছিল চিত্রকূট পাহাড়ে। অথচ ধনের অধিপতি কুবের পুষ্পক রথে চেপে আকাশে উড়ে বেড়াতেন। লঙ্কার রাজা রাবণ সেই রথ কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর রাবণকে বধ করে রাম সেই রথে চেপেই সবাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। মহাভারতেও এই রকমের কথা আছে। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে আকাশ পথে রথ পাঠিয়েছিলেন। তার মানে সেকালের বড়লোকেও আকাশে উড়ত, আর গরিব লোক পায়ে হেঁটে চলত। তবে এখন সমাজ অনেক বদলেছে। এখন সাধারণ মানুষও বাসে বা ট্রেনে চড়ছে, আকাশেও উড়ছে এরোপ্লেনের টিকিট কেটে।

ঠিক এই সময়েই ভৌ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভৌ ভৌ করে চেঁচাতে লাগল, তারপর



দরজার কাছে ছুটে গিয়ে একটা ছোট মেয়ের গায়ের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে আমি বললাম : ভৌ ওকে কামড়ে দেবে না তো!

কিন্তু মেয়েটি নির্ভয়ে ভৌকে আদর করতে করতে ভেতরে চলে এসে বলল : আমাকে কামড়াবে না, আমি ফিরে এসেছি বলে খুশী হয়েছে।

ভৌ জিভ বার করে তার হাতটা চেটে দিল। মেয়েটি কাছে এসে বলল : গুড ইভনিং আঙ্কল, আন্টি কোথায়?

ইয়েস সার আঙ্কল্ হেসে বলল : দেশে গেছে, রিমঝিম। তা তোমরা অ্যামেরিকা থেকে কবে ফিরলে?

রিমঝিম বলল : আজই ফিরেছি আঙ্কল্। কিন্তু দেশটা কী সুন্দর! ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না।

কোন্ কোন্ শহর দেখলে?

মামা ছুটি পায় নি বলে এবারে কোথাও যাওয়া হয় নি। বলেছে, পরের বারে সব দেখিয়ে

দেবে।

হঠাৎ বাইরে কারও ডাক শুনে রিমঝিম পালিয়ে গেল। আর ইয়েস সার আঙ্কল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল : আজকাল বিদেশে গিয়ে তাদের বাইরেটা দেখেই আমাদের চোখ ঝল্‌সে যায় গোপাল, তাদের ভেতরটা আমরা দেখতে চাই নে। আর এই এরোপ্লেনের কল্যাণে আমরা মাটির সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছি। দেশের মানুষের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক গেছে চুকে। যখন আমরা পায়ে হেঁটে পথ চলতাম, তখন এই পথ চলা ছিল আমাদের শিক্ষার অঙ্গ, এই বিরাট দেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠত। উড়োজাহাজের যুগে দূরের দেশ এসেছে নিকটে, কিন্তু নিজের দেশের মানুষ হয়েছে পর। তাই তোমার মামু চাইছে যে আমরা মোটর গাড়িতে চড়ে ভারত দর্শনে বের হই। পায়ে হেঁটে তো বেশি দূরে যেতে পারব না। সে সময় নেই, সে ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি। তাই মোটরে আমরা দেখতে দেখতে যাব। মানুষের সঙ্গে মিশব, আদান প্রদান করব নিজেদের সুখ দুঃখের।

আমি বললাম : হৈচৈ চাচা বলছিল যে পুরনো দিনের অনেক কথা তোমার জানা আছে। অনেক পুরনো গল্প।

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : অনেক নয়, দু একটা গল্প জানা আছে। এই সব গল্পের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ঐতরেয় মহিদাসের গল্প। সে যখন ছোট ছিল তখন তার শেখবার ইচ্ছে ছিল খুব, কিন্তু লেখাপড়া শেখার বাধা ছিল অনেক।

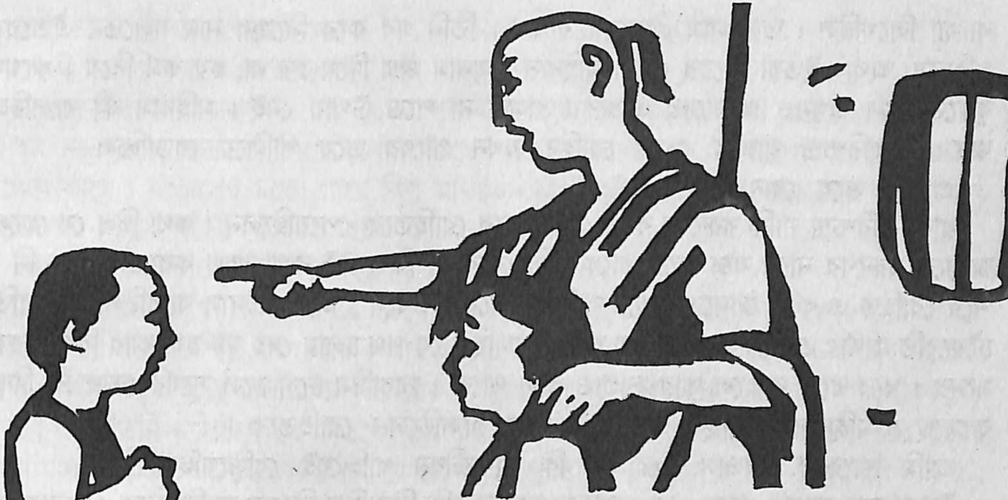
বাধা কিসের ?

জাতপাত নিয়ে দেশে তখন খুব গোঁড়ামি। যারা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, তারা গুরুর কাছে লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু শূদ্ররা শুধু সকলের সেবা করবে, লেখাপড়া শেখার অধিকার তাদের নেই।

ঐতরেয় মহিদাস বুঝি শূদ্রের ছেলে ছিল ?

তাও না। তার মা ছিলেন শূদ্রের মেয়ে, কিন্তু বিয়ে হয়েছিল এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। সেই ব্রাহ্মণ একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকেও বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁরও একটি ছেলে ছিল মহিদাসের সমবয়সী।

তারপর ?



ইয়েস সার আঙ্কল বলল : একদিন যজ্ঞের সময়ে সেই ব্রাহ্মণের ছেলে দুটি তাদের বাবার কাছে এল পড়াশুনো করবার জন্যে । ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণীর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মহিদাসকে দিলেন ফিরিয়ে । সে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল । মহিদাসের ইতরা মা বললেন, তোমার ভাবনা কী ! আমরা তো মা পৃথিবীর সন্তান, তুমি পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়, পৃথিবীই তোমাকে সব শিখিয়ে দেবেন ।

কিন্তু পৃথিবী শেখাবেন কী করে ?

কেন, আমাদের জানবার কথা সবই তো ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বুকে । পৃথিবী পরিক্রমা করেই সব শিখে নেওয়া যায় । বুঝতেই পারছ, গুরু তো দূরের কথা, নিজের বাবাই মহিদাসকে শিক্ষা দিতে চান নি সে ইতরা মায়ের ছেলে বলে । ব্রাহ্মণ সেই মেয়েকে বিয়ে করেও জাতে তুলতে পারলেন না, ছেলেকে ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মানতেও পারলেন না, সমাজের অন্য ব্রাহ্মণদের সামনে । কিন্তু মহিদাস হার মানে নি, সে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথিবী ভ্রমণে । নিজের চোখে দেখেই সে সব কিছু শিখেছিল । আর শুনে আশ্চর্য হবে যে এই ছেলেটিই বড় হয়ে ঋগ্বেদের

ব্যাখ্যা লিখেছিল। তার নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। তিনি গর্ব করে নিজের নাম বলতেন ঐতরেয় মহিদাস, অর্থাৎ ইতরা মায়ের ছেলে মহিদাস। সুনাম জন্ম দিয়ে হয় না, হয় কর্ম দিয়ে। ঋগ্বেদ বুঝতে হলে এখনও আমাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ না পড়ে উপায় নেই। মহিদাস কী বলেছিল জানো ? হরিশ্চন্দ্র রাজার ছেলে রোহিত যখন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল—

প্রাণের ভয়ে কেন ?

রাজা হরিশ্চন্দ্র নাকি বরুণের কাছে মানৎ করে রোহিতকে পেয়েছিলেন। কথা ছিল যে ছেলে জন্মালে বরুণের নামে যজ্ঞ করে তাকে বলি দেবেন। কিন্তু এই কথা রক্ষা করতে পারেন নি। পরে রোহিত এ কথা জানতে পেরে পালিয়ে গিয়েছিল বনে। আর মহিদাস বলেছিল, চরৈবেতি চরৈবেতি অর্থাৎ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। বলেছিল যে পথ চলায় দেহ দৃঢ় হয়, আর বিকাশ হয় মনের। ঘরে বসে থাকলে তার ভাগ্যও বসে থাকে। সারাদিন চলে চলে সূর্যের তেজ কি কিছু কমেছে ? মহিদাস বলেছিল, ইন্দ্র এই কথা বলেছিলেন রোহিতকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : রোহিত কি সারাজীবন পালিয়েই বেড়িয়েছিল ?

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : না। তাকে একজন বুদ্ধি দিয়েছিল নিজের বদলি দিতে। শুনঃসেপ নামে এক গরিব ব্রাহ্মণের ছেলেকে কেনা হয়েছিল, কিন্তু সে বিশ্বামিত্র ঋষির পরামর্শে বরুণের স্তব করেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

তারপরেই বলল : আজকাল আমরা গুরুর কাছে শিক্ষা নিই। পাঠশালায় গুরুমশাই, স্কুল কলেজে টীচার প্রফেসার, ধর্মকাজ করতে গেলেও গুরু ধরতে হয়। লোকে বলে গুরু ছাড়া কোন কাজ হয় না। আর গুরু যা চাইবে তাই দিতে হবে দক্ষিণা। মহাভারতের দ্রোণাচার্য একলব্যকে কিছু না শিখিয়েই তার বুড়ো আঙুলটা নিয়েছিলেন গুরু দক্ষিণা। লোকে একলব্যের গুরুভক্তির প্রশংসা করেছে, কিন্তু গুরুর অন্যায় চাওয়ার কোন নিন্দা করে নি। শুনে আশ্চর্য হবে যে দত্তাত্রেয় ঋষির গুরু ছিল চব্বিশ-জন। যে বংশে কৃষ্ণের জন্ম, সেই বংশের আদিপুরুষ যদুকে দত্তাত্রেয় নিজের মুখে এই কথা বলেছিলেন। এই চব্বিশজন গুরু কে ছিল তা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। কোন মুনি ঋষি বা পণ্ডিত লোক তাঁর গুরু ছিলেন না। তাঁর গুরু ছিল পৃথিবী পর্বত বৃক্ষ আকাশ বাতাস আগুন, এমনকি পশুপাখি মাকড়শা আরশোলা ও কাঁচপোকাও তাঁর গুরু ছিল। সবার

কাছেই তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম : কী রকম শিক্ষা?

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : এই যেমন পৃথিবীর কাছে শিখেছিলেন ক্ষমা ব্রত, নিজের জন্ম ও জীবন যে পরের জন্য তা শিখেছিলেন পর্বতের কাছে, পরাধীনতা ও পরোপকার শিখেছিলেন বৃক্ষের কাছে। বাতাসের মতো গায়ে কিছু মাখতে নেই, নির্মল হতে হবে আকাশের মতো, আর আগুনের মতো পবিত্র থাকতে হবে।

পশু-পাখির কাছে কী শিখেছিলেন?

একটা ছোট পাখির মুখে খাবার দেখে বড় পাখিরা তাকে আক্রমণ করেছিল। সেই খাবার ফেলে দিয়ে ছোট পাখিটা রক্ষা পায়। আর বাচ্চাদের মায়ায় পায়রা ধরা পড়েছিল ব্যাধের জালে। আর একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন দত্তাত্রেয়। আরশোলা নাকি কাঁচপোকার ভয়ে কাঁচপোকা হয়ে যায়। তাই তিনি বলেছেন যে কাউকে ভয় পেতে নেই, ভয় পেলে নিজের অস্তিত্ব আর বজায় রাখা যায় না। এই জন্যেই বলছিলাম যে চোখ কান খুলে ভ্রমণ করলে অনেক কিছুই শেখা যায়। ভ্রমণকেই গুরু বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ একজন গুরু যা শেখাতে পারেন, তার চেয়ে বেশি শেখা যেতে পারে নিয়মিত ভ্রমণ করে।

হৈচৈ চাচা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি পাহাড় বা সমুদ্র দেখেছি কিনা এবং কোথায় কোথায় গিয়েছি। উত্তরে আমি বললাম : পাহাড় দেখেছি, সমুদ্রও দেখেছি। একবার মসুরি গিয়েছিলাম, আর একবার কোভালমে।

হৈচৈ চাচা বলল : কোভালম মানে তো কেরালার বীচ? তার মানে পাহাড়ও দেখ নি। সমুদ্রও না।

কেন?

মসুরি একটা শহর, হিমালয় পাহাড় নয়। আর কোভালমও সমুদ্র নয়, ও একটা স্নানের ঘাট।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : মসুরি তো হিমালয় পাহাড়েই, আর কোভালমও আরব সাগরের তীরে।

হৈচৈ চাচা কয়েকটা পান একসঙ্গে মুখে পুরে বলল : হ্যাঁ, হাঁস যেমন পাখি, তেমন মসুরি হল

হিমালয় আর কোভালম সমুদ্র। সমুদ্র দেখতে হলে চল আন্দামানে, আর হিমালয় দেখবে কেদারনাথ বা রূপকুণ্ডে যাবার পথে। বরফের ওপর দিয়ে না হাঁটলে কি হিমালয় দেখা হয়! লোকে বলে ভারত দর্শন করতে হলে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এইভাবে দেখতে হয়। কিন্তু উত্তরে শুধু হিমালয় আর দক্ষিণে সমুদ্র নয়। দেশটা এত বড় যে দেখবার জায়গা যে কত বিচিত্র তা আগে ভাগেই জেনে নিতে হয়। তুমি একটা লিস্ট তৈরি করে ফেল দর্শনীয় স্থানের বিষয় অনুসারে—যেমন পাহাড়ে শৈলাবাস, সমুদ্রের ধারে সৈকতাবাস, ঐতিহাসিক স্থান, তীর্থস্থান নানা ধর্মের, পশু ও পাখির অভয়ারণ্য, গুহামন্দির—এক এক জায়গায় এক এক রকম আকর্ষণ। ভারত দর্শনে বেরোলে সে সব সাজিয়ে নিতে হয়—শুধু অঞ্চল ধরে নয়, কোন্ রাজ্যে কী কী দেখবার আছে তা জানতে হবে।

তারপরেই জিজ্ঞেস করল : ভারতে কটা রাজ্য জানো? ক রকমের রাজ্য?

বললাম : গুণে দেখি নি।

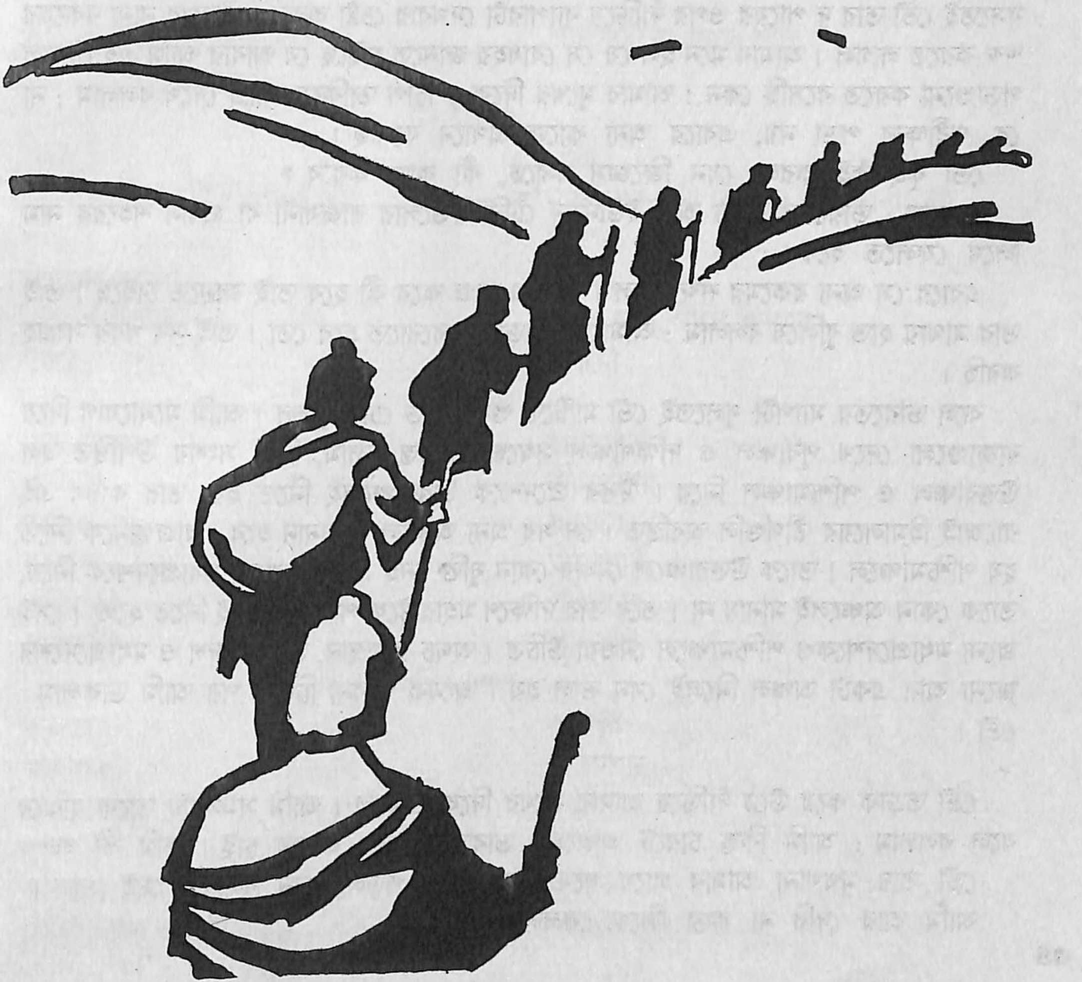
হৈচৈ চাচা বলল : এখন সব শুদ্ধ একত্রিশটা রাজ্য, তার মধ্যে ইউনিয়ন টেরিটরি আছে অনেকগুলো। একটা বোধহয় কমে যাবে, থাকবে ত্রিশটা।

কমবে কেন? সাধারণত তো বাড়ে?

এইবারে কমবে। কারণ চণ্ডীগড় একটা ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল—পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এই দুটি রাজ্যের রাজধানী। নতুন ব্যবস্থায় চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের ভাগে পড়েছে এবং হরিয়ানার রাজধানী হবে অন্য কোন জায়গায়। তাই চণ্ডীগড় আর ইউনিয়ন টেরিটরি থাকবে না।

এরপর হৈচৈ চাচা আমার হাতে কয়েকটা বই দিয়ে বলেছিল : রাজ্য আর তাদের রাজধানী বা প্রধান শহরগুলো তুমি অঞ্চল হিসেবে সাজিয়ে নাও। তারপর যে সব জায়গা দেখবার ইচ্ছে, সেই সব জায়গার নাম লিখে ফেল। আমরা দিল্লী থেকে বেরোব, কাজেই তোমাকে একটা ছক কেটে ফেলতে হবে। এই কাজটা শেষ করে তুমি আমাকে দেখিয়ে নেবে। মনে রেখো, আমরা ভারতের প্রধান দর্শনীয় স্থানের একটাও বাদ দিতে চাই না।

যে টেবল চেয়ারে বসে আমি পরীক্ষার পড়া পড়তাম, বইপত্র নিয়ে আবার সেই টেবলে



বসতেই ভৌ তার দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করল। তারপর নানা রকমের শব্দ করতে লাগল। আমার মনে হল যে সে বোধহয় জানতে চাইছে যে আবার আমি এই টেবলে পড়াশুনো করতে বসেছি কেন! আমার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে দেখে বললাম : না রে, পরীক্ষার পড়া নয়, এবারে অন্য কাজে এখানে বসেছি।

ভৌ কুঁই কুঁই করল, যেন জিজ্ঞেস করছে, কী কাজ কর'ব ?

বললাম : ভারতের রাজ্য আর ইউনিয়ন টেরিটরিগুলোর রাজধানী বা প্রধান শহরের নাম লিখে ফেলতে হবে।

এবারে সে অন্য রকমের শব্দ করল। যেন এ কাজ করে কী হবে তাই জানতে চাইছে। তাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম : আমাদের বেড়াতে বেরোতে হবে তো! তাই সব খবর সংগ্রহ করছি।

বলে ভারতের ম্যাপটা খুলতেই ভৌ মাটিতে শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজল। আমি মনোযোগ দিয়ে রাজ্যগুলো দেখে পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্তু সংশয় উপস্থিত হল উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে। উত্তর প্রদেশকে উত্তরাঞ্চলেই নিতে হয়, তার কারণ এই রাজ্যেই হিমালয়ের তীর্থগুলি অবস্থিত। সে সব অন্য অঞ্চলে বেমানান হবে। রাজস্থানকে নিতে হয় পশ্চিমাঞ্চলে। তাকে উত্তরাঞ্চলে নেবার কোন যুক্তি নেই। বিপদ বাধল মধ্যপ্রদেশকে নিয়ে, তাকে কোন অঞ্চলেই মানায় না। তবে তার দক্ষিণে মহারাষ্ট্রকে পশ্চিমাঞ্চলেই নিতে হচ্ছে। সেই জন্যে মধ্যপ্রদেশকেও পশ্চিমাঞ্চলে নেওয়া উচিত। অথচ রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের জন্যে আর একটা অঞ্চল নিলেই যেন ভাল হয়। অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমি ডাকলাম ভৌ!

ভৌ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি সমস্যাটা তাকে বুঝিয়ে বলে বললাম : আমি কিন্তু চারটে অঞ্চলেই ভারতকে ভাগ করতে চাই। তুমি কী বল ?

ভৌ তার মুখখানা আমার গায়ে ঘষে দিয়ে শুয়ে পড়ল, যেন বলল : সেই ভাল।

আমি আর দেরি না করে লিখে ফেললাম—

রাজ্য বা ইউনিয়ন টেরি-টরি	রাজধানী বা প্রধান শহর
উত্তরাঞ্চল	
দিল্লী	দিল্লী
হরিয়ানা-রাজধানী চণ্ডিগড়ে ছিল,	নতুন রাজধানী কোথায় হবে জানা নেই
পাঞ্জাব	চণ্ডিগড়
হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
জম্মু ও কাশ্মীর	শীতে জম্মু, গ্রীষ্মে শ্রীনগর
উত্তর প্রদেশ	লখ্নৌ
দক্ষিণাঞ্চল	
অন্ধ্র প্রদেশ	হায়দ্রাবাদ
কর্নাটক	ব্যাঙ্গালোর
তামিলনাড়ু	ম্যাড্রাস
কেরালা	ত্রিবেন্দ্রাম
পণ্ডিচেরি	পণ্ডিচেরি
লাক্ষা দ্বীপ	কাবারত্থি
পশ্চিমাঞ্চল	
রাজস্থান	জয়পুর
গুজরাত	গান্ধীনগর
মধ্য প্রদেশ	ভোপাল
মহারাষ্ট্র	বম্বে
দাদ্‌রা ও নগর হাভেলি	সিলভাসা
গোয়া, দমন ও দিউ	গোয়ার পানাজি

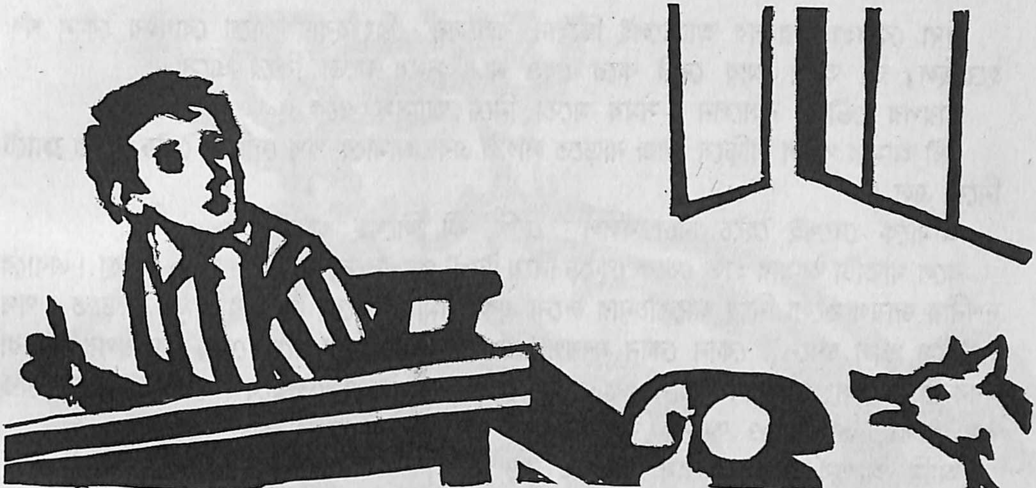
পূর্বাঞ্চল

বিহার	পাটনা
উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর
পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা
আসাম	গুয়াহাটি
সিকিম	গ্যাংটক
মেঘালয়	শিলং
ত্রিপুরা	আগরতলা
নাগাল্যাণ্ড	কোহিমা
মণিপুর	ইম্ফল
মিজোরাম	আইজল
অরুণাচল প্রদেশ	ইটানগর
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার

এইবারে উত্তরাঞ্চলের দর্শনীয় স্থানগুলি আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। দিল্লী নিয়ে ঝামেলা নেই। পুরনো আর নতুন দিল্লী দেখলেই চলবে। কিন্তু হরিয়ানার চণ্ডিগড় গেলে আর কী রইল তা জানা নেই। পানিপথ আর কুরুক্ষেত্রেতো দুটো বড় যুদ্ধ হয়েছিল, কিছু দেখবার আছে কিনা কে জানে! বললাম : কিরে ভৌ, কিছু দেখবার আছে?

ভৌ শুয়ে শুয়েই উত্তর দিল, কুঁই কুঁই।

এর মানে বোধহয় না, কিছু নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তারপর হিমাচল প্রদেশ। সিমলা তো আছেই, আশে পাশে নাকি অনেক কিছু দেখবার আছে। চাম্বা উপত্যকায় ডালহৌসি, কাংড়া উপত্যকায় কাংড়া, ধরমশালা ও জ্বালামুখী, কুলু উপত্যকায় কুলু ও মানালি, আরও উত্তরে লাহৌল ও স্পিতি উপত্যকা। হিমালয়ে এ সবই সুন্দর জায়গা। কিছুই বোধ হয় বাদ দেওয়া ঠিক নয়. তারপর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। জম্মু তো পথেই পড়বে, শ্রীনগর ও আশপাশের জায়গা নিশ্চয় খুব সুন্দর। উত্তরে লাদাখ কেমন জায়গা জানি নে। শ্রীনগর থেকেই সবাই ফিরে আসে।



আমি ম্যাপ দেখে দেখে খাতায় সব টুকে রাখছিলাম। উত্তর প্রদেশে এসে দেখলাম যে বড় বড় শহর অনেকগুলো—লখনৌ, কানপুর, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বারানসী, অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরেও অনেক দেখবার জায়গা—কুমায়ুন পাহাড়ে নৈনিতাল, রানিখেত আলমোড়া, দুন উপত্যকায় মসুরি হরিদ্বার ঋষিকেশ, তারপর যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদারনাথ বদ্রীনাথ। কিছুই বোধহয় বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু পাহাড়ের ওপরে এ সব জায়গা দেখা কি সম্ভব হবে?

ভৌ এতক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। হঠাৎ সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই টেলিফোনের পাশে ছুটে গেল। তারপরেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু দেরি না করে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে হৈচৈ চাচা বলল : আজ তোমার দেরি হচ্ছে কেন গোপাল? হিরোশি তো অনেকক্ষণ আগেই অফিসে চলে গেছে। ভৌ তোমাকে কিছু বলে নি? সে তো এসে আমাকে দেখে গিয়েছিল!

লজ্জিতভাবে আমি বললাম : আমি এখুনি আসছি চাচা।

বলে ভৌকে জিজ্ঞেস করলাম : ওরে, টেলিফোন বাজবার আগেই তুই বুঝলি কী করে?

দিদা বোধহয় দরজার আড়ালেই ছিলেন, বললেন : রিং হবার আগে বোধহয় কোন শব্দ হয়েছিল। তা আজ আর দেরি করে খেও না। সময় মতো ফিরে এসো।

তারপর ভৌকে বললেন : সময় মতো নিয়ে আসিস ওকে।

ভৌ আমার পাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল এবং আমাকে পথ দেখিয়ে হৈচৈ চাচার ফ্ল্যাটে নিয়ে এল।

আমাকে দেখেই হৈচৈ চাচা বলল : দেখি, কী লিখেছ খাতায় !

বলে খাতাটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বলল : বহুত আচ্ছা। এবারে দর্শনীয় জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে একটা মিটিং ডাকো তোমার মামুর বাড়িতে। পথ ঘাট সে ভাল জানে। কোন্ কোন্ জায়গা দেখাতে পারবে তা বলে দেবে। তারপর আমরা দরকারি তথ্য সংগ্রহ করব। তবে একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে। আজ এই ভারত যত বড় দেখছ, তা আরও অনেক বড় ছিল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : আরও বড় !

আরও অনেক বড়। আদি যুগে কত বড় ছিল তা বলতে পারব না। সে কথা তুমি ইয়েস সারের কাছে জেনে নিও। আমরা তোমার মতো বয়সে ইতিহাসের যে বই পড়েছি, তাতে জেনেছিলাম যে এ দেশের প্রথম সম্রাট অশোকের সময়ে শুধু বাঙলা দেশ আর পাকিস্তান নয়, আফগানিস্তানওছিল ভারতেরই অন্তর্গত। কান্দাহার অঞ্চলকেই বলত গান্ধার, রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশাওয়ার অঞ্চলে। গান্ধারের শিল্পকলাকে ভারতেরই শিল্পকলা বলে মনে করা হয়। পূর্বে আসাম ও দক্ষিণে কেরালা ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। ভারতের প্রথম সম্রাট কিন্তু মহাপদ্ম নন্দ। তিনিই আর্যাবর্তের ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করে উত্তর ভারতে একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল মগধে। মগধ জানো তো ?

বললাম : না।

হৈচৈ চাচা বললেন : মহাভারতে মগধের রাজা ছিলেন জরাসন্ধ। আর তাঁর রাজধানী ছিল বিহারের গিরিব্রজ অর্থাৎ রাজগিরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের প্রায় সব রাজা মারা পড়লে



যুধিষ্ঠির সম্রাট হয়ে বসেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় থেকে একটা অব্দেরও প্রচলন করেন। কিন্তু পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানে যাবার পর এ দেশে আর কেউ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেন নি। সমস্ত দেশটা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। কোন রাজ্যে রাজা ছিল, আবার কোন রাজ্যে সাধারণতন্ত্র ছিল। যে সব রাজ্যে সাধারণতন্ত্র ছিল, সেখানে রাজার ছেলে রাজা হত না। প্রজারাই রাজা নির্বাচন করত। মানে প্রতিপত্তিশালী লোকেরা একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করত, তারই ওপরে থাকত রাজ্যশাসনের ভার। যে সব বড় রাজ্যে রাজা ছিল, তাদের নাম হল কোশল মানে অযোধ্যা, মগধ মানে দক্ষিণ বিহার, বৎস মানে এলাহাবাদ ও অবন্তী মানে মালব। বৈশালী মানে উত্তর বিহারে লিচ্ছবি, দক্ষিণ বিহারে পাবায় ও উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে মল্ল ও কপিলবাস্তুর শাক্যদের মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই সব রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। কোশল কাশী রাজ্য ও শাক্যদের রাজ্য জয় করে বেশ বড় হল, মগধও বেড়ে উঠল অঙ্গ ও লিচ্ছবিদের দেশ জয় করে। তারপর কোশল ও মগধের মধ্যে যুদ্ধ বাধল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কে জিতল চাচা ?

হৈচৈ চাচা বলল : যুদ্ধ কেন বাধল তা জানতে চাইলে না ?

বললাম : বল ।

হৈচৈ চাচা বলল : খ্রীষ্টের জন্মের ছশো বছর আগে মগধে শিশুনাগ নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় । এই বংশের পঞ্চম রাজার নাম বিম্বিসার । গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের সময়ে তিনি মগধের রাজা ছিলেন । তাঁর বিয়ে হয়েছিল কোশলের রাজা প্রসেনজিতের বোনের সঙ্গে । অজাতশত্রু বিম্বিসারের ছেলে, তাঁর জন্ম অন্য রাণীর গর্ভে । তাই রাজা হবার পর অজাতশত্রু নাকি বিম্বিসারকে বধ করেন । আর প্রসেনজিতের বোন বুড়ো রাজার শোকে প্রাণত্যাগ করেন ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : সে কি ? অজাতশত্রু তার বাবাকে বধ করল কেন ?

হৈচৈ চাচা বলল : তা বলতে পারব না । তবে মগধ ও কোশলের মধ্যে যুদ্ধের কারণ এইটাই । প্রসেনজিৎ তার বোন ও ভগিনীপতির মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজের দেওয়া গ্রামখানি কেড়ে নিলেন । অজাতশত্রু এলেন যুদ্ধ করতে । অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলল । তারপর সন্ধি হল । প্রসেনজিৎ নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন অজাতশত্রুর সঙ্গে, গ্রামটিও ফিরিয়ে দিলেন । তারপর থেকে মগধের ক্ষমতাই বাড়তে লাগল । নানা রাজ্য জয় করে অজাতশত্রুই একটা সাম্রাজ্য গড়তে আরম্ভ করেছিলেন । কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন যে নিজের বাবাকে বধ করা তাঁর উচিত হয় নি । এর জন্যে তাঁর খুব অনুতাপ হয় এবং শেষে তিনিও বুদ্ধের শিষ্য হয়েছিলেন ।

আমি বললাম : অজাতশত্রু বিম্বিসারকে কেন মেরেছিলেন আমি বলব চাচা ?

বল ।

বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্য হয়েছিলেন বলে । বুদ্ধের ধর্ম তিনি মানতেন না, আর কেউ সে ধর্ম মানুক তাও তিনি চাইতেন না । আমার মনে হয় যে ধর্ম রক্ষার জন্যেই অজাতশত্রু তাঁর বাবাকে বধ করেছিলেন ।

হৈচৈ চাচা আশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি এ কথা জানলে কী করে ?

বললাম : রবীন্দ্রনাথ পূজারিনী নামে যে কবিতা লিখেছেন, তাতে আছে যে বুদ্ধের স্তূপে বাতি জ্বালাবার জন্যে পূজারিনীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ।

হৈচৈ চাচা বলল : এই রকমই কিছু হবে। ধর্মের নামে হিংসা এখনও চলছে। কিন্তু হিংসায় যে ধর্ম নেই, লোকে তা বোঝে না।

বললাম : তারপর কী হল বল।

হৈচৈ চাচা বলল : অজাতশত্রুর পর আরও চারজন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যেই একজন রাজগির থেকে রাজধানী সরিয়ে আনেন গঙ্গার তীরে পাটলিপুত্রে। পাটলিপুত্র হল এখনকার পাটনা। শিশুনাগ বংশের পরেই মহাপদ্ম নন্দ। তিনি জাতে শূদ্র ছিলেন। আর শূদ্র ছিলেন বলেই সেকালের ব্রাহ্মণেরা তাঁকে কলির অংশ বলতেন এবং তাঁর প্রচলিত নন্দাব্দকেই কল্যব্দ বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর ছেলেদের রাজত্বকালেই গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন।

আমি বুদ্ধের কথা ভাবছিলাম, ভাবছিলাম বর্ধমান মহাবীরের কথা! হৈচৈ চাচা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলেন বলে বাধা দিয়ে বললাম : বুদ্ধ আর মহাবীর সম্বন্ধে কিছু বলবে না চাচা?

শুনবে?

বলে হৈচৈ চাচা একটু ভেবে নিল। তারপর বলল : গৌতম বুদ্ধ শাক্যদের এক রাজার ছেলে। কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছিল লুম্বিনী নামে এক বনে বৈশাখী পূর্ণিমায়। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর রাজা ছিলেন তাঁর বাবা শুদ্ধোধন, তাঁর মা মায়াদেবী যাচ্ছিলেন বাপের বাড়ি। গৌতমের জন্মের পরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এ বোধহয় খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৭ বছর আগের ঘটনা। গৌতম বড় চিন্তাশীল ছিলেন। বড় অন্যমনস্ক। তাই তাঁকে সংসারী করবার জন্যে তাঁর বাবা গোপা নামে এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। তাঁদের একটি ছেলেও হয়। কিন্তু সংসারে নানা রকম দুঃখ দেখে গৌতম ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে দুঃখ মোচনের উপায় খুঁজতে লাগলেন। তারপর গয়ার কাছে এক অশ্বত্থ গাছের নিচে ছ বছর তপস্যা করে তিনি জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হলেন। কাশীর কাছে সারনাথে গিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার করলেন। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি নানা জায়গায় ঘুরেছেন। প্রায় আশি বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের কাছে কুশীনগরে তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েকটা জায়গার নাম তোমার খাতায় লিখে নাও।

আমি পেনসিল হাতে নিয়ে খাতা খুলতেই হৈচৈ চাচা বলল : বৌদ্ধ তীর্থগুলির নাম—লুম্বিনী

বুদ্ধের জন্মস্থান, বুদ্ধগয়ায় তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন, সারনাথ থেকে প্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন, আর দেহত্যাগ করেন কুশীনগরে। তাঁর জীবনের বহু বছর কেটেছে বিহারের রাজগিরে, বৈশালীতেও তিনি গিয়েছিলেন। বুদ্ধের জীবন ও শিল্প স্থাপত্যের জন্যে বিখ্যাত হয়েছে শ্রাবস্তীপুর, সঙ্কাশ্য, সাঁচী, অজন্তা-ইলোরা প্রভৃতি গুহামন্দির এবং দক্ষিণ ভারতের অমরাবতী।

হৈচৈ চাচা একটু থেমে বলল : ইয়েস সার বলে বুদ্ধের ধর্ম কোন নতুন ধর্ম নয়, বুদ্ধের মতো কথা যড়দর্শনেও আছে। বুদ্ধ ঈশ্বর মানেন নি, বেদ ঈশ্বরের কথা বলেও স্বীকার করেন নি। যাগ যজ্ঞ ও জাতিভেদ প্রথাও তিনি অস্বীকার করেছিলেন৷ তিনি দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করে দুঃখ দূর করার উপায় বলেছিলেন। তিনি মুক্তির যে পথ দেখিয়েছেন, তা গৃহত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসীরই মতো।

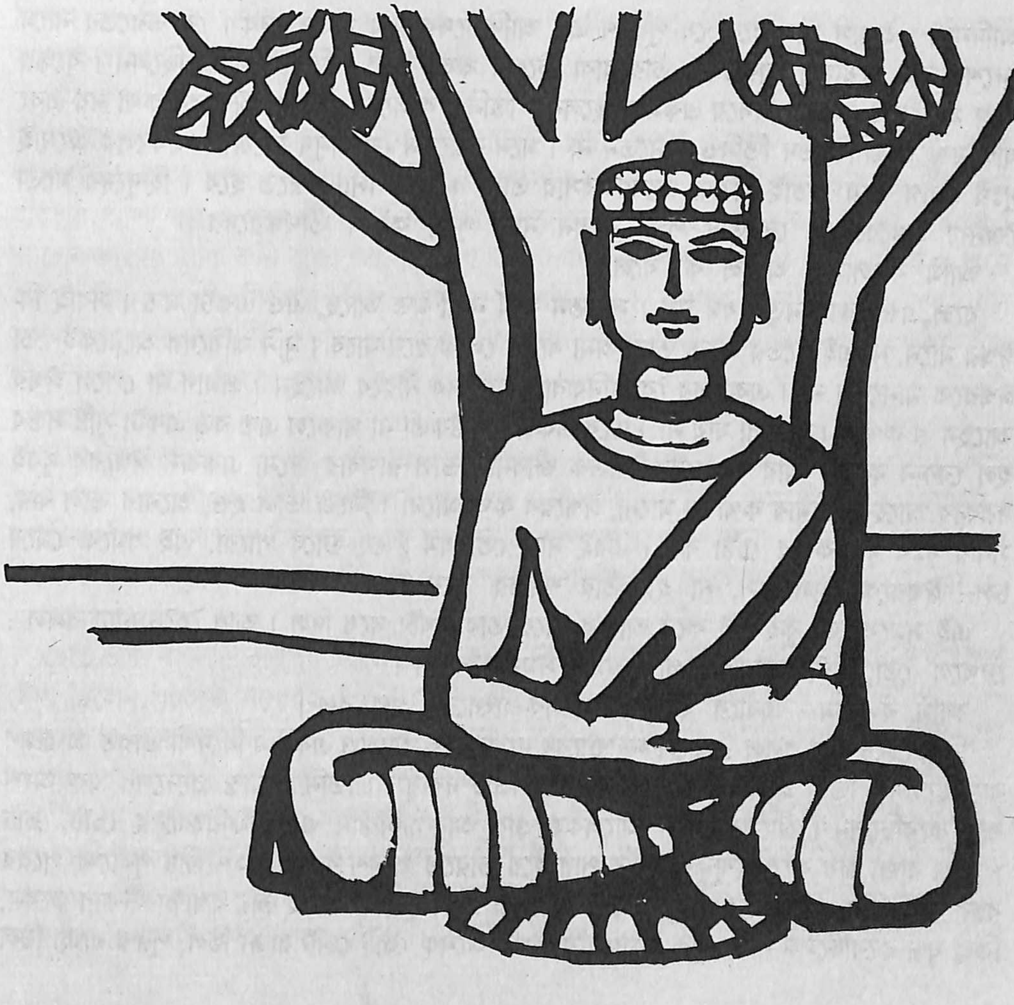
আমি বললাম : আর বর্ধমান মহাবীর ?

হৈচৈ চাচা বলল : বুদ্ধের জন্মের সাতাশ বছর পরে তাঁর জন্ম হয় বিহারের মজঃফরপুর জেলার বৈশালী নগরের কাছে। তাঁর বাবা সিদ্ধার্থ ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় নায়ক এবং লিচ্ছবি রাজকন্যা ছিলেন তাঁর মা ত্রিশলা। তিনি বিয়ে করেন যশোদাকে এবং তাঁরও একটি মেয়ে হবার পর সংসার ত্যাগ করেন ত্রিশ বছর বয়সে। বারো বছর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভের পর তিনি জিন হন এবং তাঁর অনুগামীদের বলা হয় জৈন। বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক বছর পর রাজগিরের কাছে পাবাপুরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জৈন তীর্থগুলির নাম লিখে নেবার জন্যে আমি খাতা পেনসিল হাতে নিলাম। তাই দেখে হৈচৈ চাচা বলল : লিখে নাও—জৈনদের সাতটি তীর্থ হল সম্মেত শিখর বা পরেশনাথ পাহাড়, আবু পাহাড়ে দিলওয়াড়া, সৌরাষ্ট্রের শত্রুঞ্জয় ও গির্ণার, দক্ষিণ ভারতে শ্রবনবেলগোলা, উড়িষ্যায় উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ও বিহারে পাবাপুরী।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : তাঁর জন্ম ভূমি কোন তীর্থ নয় ?

হৈচৈ চাচা বলল : তার কারণ আছে। জৈনরা বিশ্বাস করে যে বর্ধমান মহাবীরের আগে আরও তেইশজন তীর্থঙ্কর ছিলেন। এই সংসারের দুঃখ পেরোবার জন্যে যাঁরা ঘাট বা তীর্থ নির্মাণ করেছেন, তাঁরাই তীর্থঙ্কর। মহাবীরের আগে ছিলেন পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ, আর প্রথম তীর্থঙ্কর



আদিনাথ। ইয়েস সার বলে যে পুরাণে এই আদিনাথের নাম ঋষভ দেব। যে ভরতের নামে দেশের নাম হয়েছিল ভারতবর্ষ, তাঁর বাবা ছিলেন ঋষভ দেব। তিনিও রাজা ছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে মহাবীরও অনেক বিষয়ে একমত ছিলেন। তিনিও বলেছেন যে বেদ ঈশ্বরের কথা নয় এবং যাগ যজ্ঞ ও জাতিভেদ তিনিও মানতেন না। মনে করতেন যে মানুষ নিজের কর্মফলের জন্যেই দুঃখ ভোগ করে। তাই মুক্তির জন্যে সংসার ত্যাগ করে তপস্যা করতে হবে। হিন্দুদের মতো জৈনরা ঈশ্বরের বা দেবতার পূজা করেন না। পূজা করেন তীর্থঙ্করদের।

আমি বললাম : আঙ্কল কী বলে?

বলে, এও কোন নতুন ধর্ম নয়। সনাতন ধর্মে নানা মত আছে, এও একটা মত। সবাই কি ঈশ্বর মানে, না এই মতের জন্যে তারা অন্য ধর্মের লোক হয়ে যাবে। মুনি ঋষিদের অনেকেই তো ঈশ্বরকে মানতেন না। একালের বৈজ্ঞানিকরাও তো সব নীরবে আছেন। প্রমাণ না পেলে ঈশ্বর আছেন এ কথাও তো বলা যায় না। তবে একজন সৃষ্টিকর্তা না থাকলে এত বড় একটা সৃষ্টি সম্ভব হল কেমন করে। আর আমাদের নৈতিক জীবনটা ভাল রাখবার জন্যে একজন ঈশ্বরের খুবই দরকার আছে। আমার কথা না মানো, ঈশ্বরের কথা মানো। নিজে ভাল হও, অন্যের ভাল কর, সবার দুঃখ দূর করার চেষ্টা কর। এরই নাম তো ধর্ম। যে ভাবে পারো, এই ধর্মকে মেনে চল—ঈশ্বরকে ভালবেসে, না হয় তাঁর শাস্তির ভয়ে।

এই সময়ে ভৌ কুঁই কুঁই করে আমার গায়ে তার মুখটা ঘষে দিল। আর হৈচৈ চাচা বলল : দেখলে তো, ভৌ আমার কথা কেমন সমর্থন করল!

আমি বললাম : এবারে তাহলে আলেকজাণ্ডারের গল্প বল।

কিন্তু হৈচৈ চাচা বলল : আলেকজাণ্ডারের দুশো বছর আগেও একজন বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছিলেন। তিনি হলেন পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট দরায়ুস। তিনি সীমান্ত প্রদেশের এক অংশ জয় করেছিলেন। গ্রীসের রাজা আলেকজাণ্ডার আফগানিস্তান ও কাফিরিস্তানের ছোট ছোট পার্বত্য রাজ্য জয় করে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, পরের বছর তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন। তক্ষশীলার রাজা যুদ্ধ না করেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু যুদ্ধ করেছিলেন রাজা পুরু। পাঞ্জাবে তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল, পুরুর রাজ্য ছিল

ঝিলম ও চিনাব নদীর মাঝে। পুরুর সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে, ছেলেবেলায় আলেকজাণ্ডার নাটকে আমরা তা শুনেছি।

কী কথা ?

বলে আমি হৈচৈ চাচার দিকে তাকাতেই চাচা বলল : যুদ্ধে পুরুকে বন্দী করে আলেকজাণ্ডারের সামনে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বন্দী, তুমি আমার কাছে কী রকম ব্যবহার আশা কর ? পুরু কী উত্তর দিয়েছিলেন জানো ? বলেছিলেন, রাজার মতো ব্যবহার। আলেকজাণ্ডার নাকি বন্দী রাজাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন, কিন্তু পুরুর এই কথা শুনে তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুতা করেছিলেন। লোকে অবশ্য বলে যে এটা আলেকজাণ্ডারের কূটনীতির চাল। তিনি পাঞ্জাবের আরও কয়েকটি রাজ্য জয় করে বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত এসে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কেন ?

তাঁর সৈন্যরা আর এগোতে অস্বীকার করেছিল। তাঁরা স্থলপথে ঝিলমের তীর পর্যন্ত ফিরে এসে বড় বড় নৌকো তৈরি করালেন, তারপর সেই নৌকোয় করে সমুদ্রের দিকে চললেন। করাচির কাছে এসে তাঁর সৈন্যদের এক ভাগ সমুদ্র পথে গেল; বাকি সেনা মরুভূমির ভেতর দিয়ে ফিরে চলল। পথে অনেক কষ্ট পেয়ে পারস্যের ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

তারপর ?

হৈচৈ চাচা বলল : তারপর চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য ও মেগাস্থিনিসের কথা। লোকে বলে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন, মহাপদ্ম নন্দেরই এক বংশধর। কিন্তু রাজার বিরাগভাজন হয়ে তিনি মগধ থেকে পাঞ্জাবে পালিয়ে এসেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, আর তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তিনি গ্রীকদের তাড়িয়ে পাঞ্জাব অধিকার করেন। তারপর মগধও জয় করেন। কৌটিল্য বা চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর মন্ত্রী ও প্রধান সহায়। এদিকে আলেকজাণ্ডারের পর সেলিউকস নামে তাঁর এক সেনাপতি গ্রীস রাজ্য অধিকার করে পাঞ্জাব অধিকার করতে আসেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। শুধু পাঞ্জাব নয়, কাবুল কান্দাহার ও হীরাট পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল পারস্যের সীমা

থেকে আসাম পর্যন্ত, আর রাজধানী হল পাটলিপুত্র। সেলিউকাস এক দূত পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের সভায়। তাঁরই নাম মেগাস্থিনিস। ইনিই সে সময়ের যে বিবরণ লিখে গেছেন, তার থেকেই আমরা অনেক কথা জানতে পারি।

হৈচৈ চাচা একটু থেমে বলল : চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবনের কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে। অত বড় যোদ্ধা, অমন দক্ষ ও বিচক্ষণ রাজা, বুড়ো বয়সে তিনি সব ছেড়ে দিয়ে জৈন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। লোকে বলে যে দক্ষিণ ভারতের শ্রবনবেলগোলায় তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ঠিক রাজা ভরতের বাবা ঋষভ দেবের মতো সর্বত্যাগী হয়ে। অশোক এই চন্দ্রগুপ্তের নাতি। তিনি বৌদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন ভারতে ও ভারতের বাইরে।

ভৌ কখন আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল দেখতে পাই নি, ফিরে এসে আমার গা ঘেঁষে ভৌ ভৌ করতে লাগল। বললাম : কী বলছিস ?

ভৌ একবার ঘড়ির কাছে গেল, ফিরে এসে হৈচৈ চাচাকে বলল ঘড়ি দেখতে। সে দিকে তাকিয়েই চাচা বলে উঠল : সর্বনাশ ! স্নান খাওয়া করতে হবে যে !

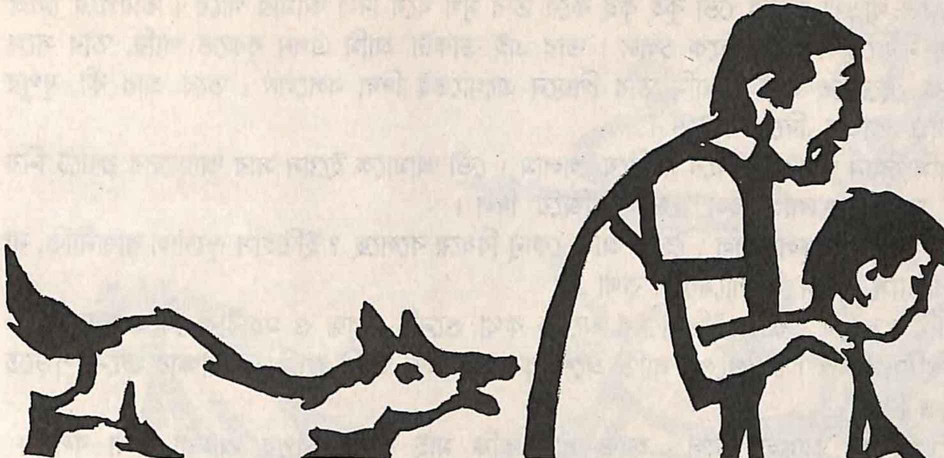
ভৌ আমার গায়ে মুখ ঘষে জানিয়ে দিল যে দিদা বোধহয় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বললাম : আমি তাহলে আসি চাচা। দিদা বোধহয় আমার অপেক্ষা করছেন।

ঠিক হ্যায় বেটা।

বলে হৈচৈ চাচা আমাকে ঘরের বাইরে পৌঁছে দিল। ভৌ খুশি হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার সঙ্গে চলল।

বাড়ি পৌঁছতেই দিদা বললেন : ওরে দাদু, ঐ পাগলদের পাল্লায় পড়ে তোরও মাথাটা যেন খারাপ না হয়ে যায়। ভাগ্যিস আজ ভৌকে বলে দিয়েছিলাম, তাই রক্ষে। সময় মতো সে তোকে টেনে এনেছে, তা না হলে আজও তোর খাওয়া হত না।

কাল যে আমি হৈচৈ চাচার কাছে খেয়েছি, এ কথা দিদার বিশ্বাস হয় নি। তাঁর ধারনা যে ওরা রোজ রাঁধে না, রান্নার লোক নেই। কোন দিন হোটেলে খায়, কোন দিন উপোস করে। হৈচৈ চাচাকে নাকি কোন মেয়ে বিয়ে করতে চায় নি, এখনও চায় না ক্ষ্যাপা বলে। আর ইয়েস সার



আঙ্কল পাগল বলে ওর বউ ওর কাছে থাকতে চায় না। দেশেই বেশির ভাগ সময় কাটায়। এই দুই বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হিরোশি মামুও ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছে। বিয়ে করল না। বিয়ে করতে চায়ও না। দিদা কোন মেয়েকে পছন্দ করলেই ঝগড়া বাধে। এ সব কথা আমি দিদার কাছে আগেই শুনেছি। তাই আজ খাবার সময় বললেন : দাদু, ওদের সঙ্গে খুব সাবধানে মেলামেশা করিস। তা না হলে এইটুকু বয়সেই তোর মাথাটা খেয়ে ফেলবে।

আমি দিদাকে সাহস দিয়ে বললাম : না দিদা, তুমি ভয় পেও না। আমি খুব সাবধানেই থাকি।

ভৌ সকালে হিরোশি মামুর ব্রেকফাস্টের সময়ে খেয়ে নেয়, তারপর আর কিছু খেতে চায় না। শুধু সঙ্গ দেবার জন্যে সামান্য কিছু খায়। তাই তার খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে গেল। তারপর ভৌ বলে একটা শব্দ করে ফিরে এল।

আমি দিদার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : কেউ বোধহয় ডেকে গেল।

আমার খাওয়া হতেই ভৌ কুঁই কুঁই করে তার মুখ ঘষে দিল আমার গায়ে। তারপরে লেজ নাড়তে নাড়তে দরজার দিকে চলল। তার এই ডাকটা আমি এখন বুঝতে পারি, তার সঙ্গে আমাকে বেরোতে হবে। আমি তার পিছনে এগোতেই দিদা বললেন : তবে আর কী, দুপুর বেলাটাও আড্ডা দিয়ে কাটাও।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ভৌ আমাকে ইয়েস সার আঙ্কলের ফ্ল্যাটে নিয় এল। দরজা খোলাই ছিল, ভৌ ভেজিয়ে দিল।

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : হৈচৈ আজ কোন্ বিষয়ে বলেছে ? ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি, না ওর অভ্যাস মতো এলোমেলো কথা ?

আমি বললাম : আজ ইতিহাসের অনেক কথা শুনেছি—বুদ্ধ ও মহাবীর থেকে চন্দ্রগুপ্ত ও মেগাস্থিনিস পর্যন্ত। চন্দ্রগুপ্তের নাতি অশোকের সব কথা আমি জানি। পরীক্ষার জন্যে পড়তে হয়েছিল।

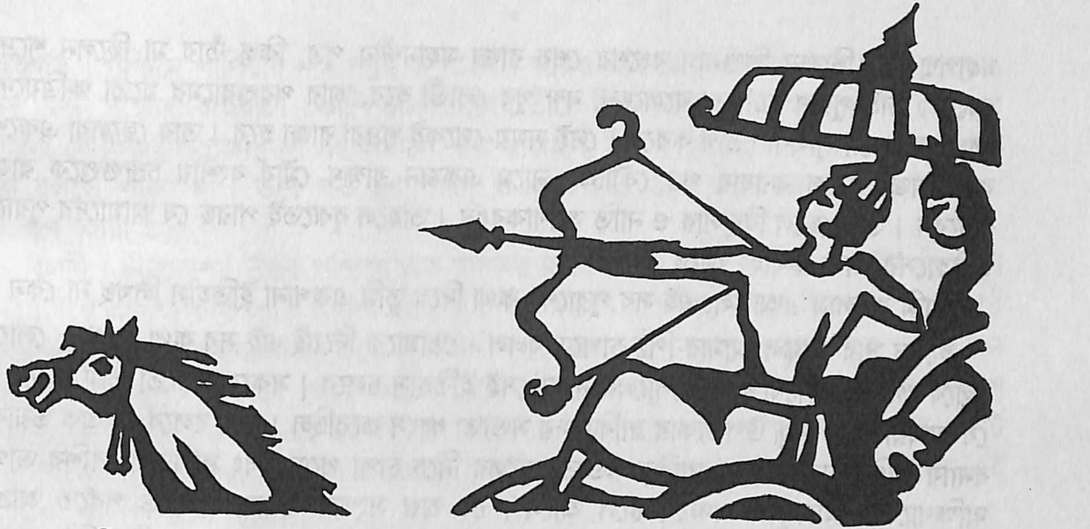
ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : হ্যাভ সাম কফি মাই বয়, তারপর আমরা কথা বলব।

আমি বললাম : এই মাত্র আমি ভাত খেয়ে এলাম আঙ্কল।

ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : সাহেবরা কফি খায় আফ্‌টার ডিনার, আমরা সব সময়ে খাই। খাবার আগে খাই, পরেও খাই। হৈচৈ বলে কফিতে ব্লাডপ্রেসার বাড়ে, আর কোলেস্টরল কমে চায়ে। আরে বাবা, চায়ে কি কোন ফুড ভ্যালু আছে ! চা খেয়ে চেহারা হয় চোয়াড়ে। আর ব্লাড প্রেসার ! আমার চেয়ে ওর প্রেসারই বেশি। একটুতেই চটে ওঠে।।

বলতে বলতেই ইয়েস সার আঙ্কল দু মগ কফি তৈরি করে আনল। বলল : আমাদের দক্ষিণে কফি কেউ কাপে খায় না। বিয়ার মগেও না। পেতলের বাটি গেলাসে ঢালাঢালি করে কফি খাবার চল।

তারপর কয়েক চুমুক কফি খেয়ে বলল : হৈচৈ-এর মতো সবারই ধারনা যে ঐ মেগাস্থিনিস লোকটা এসেছিল বলেই এ দেশের ইতিহাস তৈরি হয়েছে। যেন আমাদের দেশের কেউ কোন তথ্য লিখে রেখে যান নি। যে যাই বলুক বা লিখুক, তুমি এ কথা মেনে নিও না। এ কথা এই জন্যেই বলছি যে বিষ্ণুপুরাণেই ভাবী রাজাদের উল্লেখ আছে। পুরাণ রচয়িতা ইতিহাসের কথাই



লিখেছেন, কিন্তু অর্জুনের নাতি পরীক্ষিতের সময়ে এই পুরাণ লেখা হয়েছে বোঝাবার জন্যে ইতিহাসের ঘটনাকে ভবিষ্যতের কথা বলতে হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তো ?

আমি বললাম : না।

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : পুরাণ রচয়িতারা নিজেদের নাম কখনও প্রকাশ করতেন না, বলতেন পরাশর মুনি বলছেন মৈত্রেয় নামে আর এক ঋষিকে। তাঁরা তো মহাপদ্ম নন্দের অনেক আগের লোক, তাই যে সব ঘটনা অনেক পরে ঘটেছে সেগুলো ভবিষ্যতের ঘটনা বলতে হত। তাই বলতে হয়েছে যে পরীক্ষিতের পঞ্চম পুরুষের সময়ে গঙ্গা হস্তিনাপুর গ্রাস করলে তাঁদের চলে যেতে হবে এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বিতে। বলা হয়েছে যে সূর্য বংশের বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হবার পর এই বংশের আরও ঊনত্রিশ পুরুষ রাজত্ব করবেন। তার মানে খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে ছশো বছর আগেও এই বংশের রাজা রাজত্ব করেছেন। চন্দ্র বংশে জরাসন্ধের পর তেইশ পুরুষ রাজত্ব করবেন, মানে খ্রীষ্টের জন্মের নশো বছর আগে তাঁর বংশ লোপ পায়। এর পরের ঘটনাও আছে। শিশুনাগ বংশের কথা আছে, মহাপদ্ম নন্দের কথাও আছে। বলা হয়েছে যে

মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন শিশুনাগ বংশের শেষ রাজা মহানন্দীর পুত্র, কিন্তু তাঁর মা ছিলেন শূদ্রের মেয়ে। তাই পুরাণ রচয়িতা বলেছেন, নন্দ খুব লোভী হবে, আর পরশুরামের মতো ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করে সে পৃথিবী ভোগ করবে। সেই সময় থেকেই শূদ্ররা রাজা হবে। তার ছেলেরা একশো বছর রাজ্য ভোগ করবার পর কৌটিল্য নামে একজন ব্রাহ্মণ মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করবেন। তাঁর ছেলে বিন্দুসার ও নাতি অশোকবর্ধন। তাহলে বুঝতেই পারছ যে আমাদের পুরাণে ইতিহাসের সব কথাই আছে।

আমি বললাম : আঙ্কল্, এই সব পুরাণের কথা দিয়ে তুমি একখানা ইতিহাস লিখছ না কেন ?

ইয়েস সার আঙ্কল আমার পিঠ চাপড়ে বলল : তোমাকে দিয়েই এই সব কথা লেখাব, লোকে বলবে গোপাল লিখেছে। গোপালের নামে সেই ইতিহাস চলবে। সকলের মতো তুমি বলবে না যে আর্যরা এসে সিন্ধু উপত্যকার দ্রাবিড়দের সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। তুমি বলবে যে এক ভয়াবহ বন্যায় পৃথিবী ডুবে গেলে দ্রাবিড় সভ্যতা জলের নিচে চাপা পড়ে এবং দ্রাবিড়রা বেশির ভাগই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে চলে আসে। যে অল্প সংখ্যক লোক পাহাড়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল, আর্যরা তাদেরই অনার্য বা দাস বলেছে বেদে। তারপর তারা সমাজে মিলেমিশে যায়। উত্তর ভারতে আর্যরা আসতেই থাকে এবং ঐতিহাসিক কালে তারা নানা নামে আসে। গ্রীকরা বহ্লীক রাজ্যের লোক, সুঙ্গ বংশের রাজা পুষ্যমিত্রর সময়ে তারা আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব জয় করেছিল। রাজা মিলিন্দ অযোধ্যা জয় করে পাটলিপুত্র পর্যন্ত এসেছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলও পুষ্যমিত্রর রাজ্য আক্রমণ করেন। শুনে আশ্চর্য হবে যে যুধিষ্ঠির যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তেমনি পুষ্যমিত্রও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর নাতি বসুমিত্র হয়েছিলেন অশ্বের রক্ষক। সিন্ধু নদের তীরে গ্রীকরা ঘোড়া আটকায়। বসুমিত্র যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে পাটলিপুত্রে ফিরে এলে অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়।

বললাম : খুব বাহাদুর নাতি তো !

ইয়েস সার আঙ্কল্ বলল : গ্রীকদের পর শক হূন পারদ কুষাণ এই সব নাম শোনা যায়। এরা কারা তা জানা দরকার। যারা হিন্দু নয়, তাদের আমরা এখন ম্লেচ্ছ বা যবন বলি। কিন্তু আগে আমরা গ্রীকদের যবন বলতাম। বহ্লীক নাম ছিল ব্যাক্ট্রিয়া প্রদেশের। এখন তা আফগানিস্তানের

অন্তর্গত। পশ্চিমে পার্থিয়ার নাম পহ্লব বা পারদ। আরও পশ্চিমে মিডিয়া বা মদ্র। এই পহ্লব ও মদ্র এখন পারস্যে বা ইরানে। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ছিল সিদিয়া, শকরা সিদিয়ান। আমার ধারনা যে বিষ্ণুর সম্রাজ্য ছিল এই অঞ্চলে, তাঁর রাজধানী ছিল বৈকুণ্ঠে। এখনকার বাকুতে কিনা তা বলতে পারব না। তবে শক হূণ পারদ ও কুষাণদের ভাল করে জেনে রাখা উচিত।

হূণ কারা ?

বলছি। চীনদেশের উত্তর পশ্চিমে এক যাযাবর জাতির বাস ছিল, তাদের নাম ইউ-চি। হূণ নামে আর এক যাযাবর জাতি তাদের তাড়িয়ে দেয়। ইউ-চি রা পশ্চিমে এসে সির-দরিয়ার উত্তরে শক নামে আর এক যাযাবর জাতিকে পরাজিত করে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। কিছু দিন পরেই তারা হূণদের তাড়া খেয়ে সির-দরিয়ার দক্ষিণে আমু-দরিয়ার পরপারে বহ্লীকদের দেশ ব্যাক্ট্রিয়া অধিকার করে। এই ইউ-চি যাযাবর জাতি গৃহস্থ হয়ে পাঁচ ভাগ হয়, তাদেরই একটি শাখা কুষাণ। পরে এরা সবাইকে জয় করে ভারতেও সাম্রাজ্য বিস্তার করে। কনিষ্ক ছিলেন এই কুষাণ জাতির শ্রেষ্ঠ রাজা।

বললাম : কণিষ্কের কথা ইতিহাসে পড়েছি।

পড়তেই হবে। শকরা এ দেশে আগে এসেছিল। তারা রাজত্ব করেছে মালব ও সৌরাষ্ট্রে। এদের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম রুদ্রদামন। পারদ বা পার্থিয়ানরা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে রাজত্ব করত। ভারতে এসে তারা কাবুল ও সিন্ধু নদের উপত্যকায় রাজত্ব করে। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ছিল অন্ধ্র রাজারা, আর একেবারে দক্ষিণে চোল, চের ও পাণ্ড্য রাজ্য। এই সব ঘটনা ঘটেছিল খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে থেকে তিনশো বছর পর পর্যন্ত। তারপর গুপ্ত সাম্রাজ্য। এই গুপ্ত বংশের রাজাদের সময়েই বিদেশীদের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়।

এর পরেই ইয়েস সার আঙ্কল প্রশ্ন করল : বিক্রমাদিত্যের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ ? বেতালের গল্প ?

বললাম : শুনেছি।

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : অনেকে মনে করেন যে খ্রীষ্টের জন্মের কিছু আগে এই বিক্রমাদিত্য ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা, তাঁরই সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা

বলেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারশো বছর পরে। তাঁরই সভায় ছিলেন কবি কালিদাস, আর কে কে ছিলেন তা বলা যায় না। এই সময়েই এ দেশের শিল্প, সাহিত্য, অঙ্ক, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান, এমন কি স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলারও আশ্চর্য উন্নতি হয়েছিল। চীনের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এই সময়ে ভারতে এসে সুন্দর বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। হিউএন চাঙ ভারতে এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের আমলে। এ সব তোমরা ইতিহাসেই পড়েছ, তাই না ?

বললাম : পড়েছি।

তাই ইতিহাসের কথা থাক। আরও এমন অনেক কথা আছে যা জানা উচিত। সে সব না জানলে ভারতের কথা সম্পূর্ণ জানা হবে না। ভারতকে এখনও আমরা চিনি না গোপাল, তোমার লেখা পড়ে ভারতকে যেন চেনা যায়।

আমার বড় ভয় করছে, আঙ্কল !

বলে আমি ইয়েস সার আঙ্কলের মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই দেখলাম যে ভৌ আমাকে লক্ষ্য করছে। সে একটা পা তুলে আমার কোলের ওপরে বুলিয়ে দিল দেখে ইয়েস সার আঙ্কল বলল : দেখলে তো, ভৌ তোমাকে সাহস দিচ্ছে। সাহসই লক্ষ্মী। ভয়কে জয় করতে না পারলে কোন বড় কাজ করা যায় না।

আমি বললাম : ইতিহাসের কথা তো পড়েছি, বাকিটা বই দেখে লেখা যাবে। কিন্তু আর কী লিখতে হবে তাতো জানি না !

ইয়েস সার আঙ্কল বলল : প্রথমে ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের কথা লিখবে, তারপর চিত্র, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, উৎসব—এ সব কথাও লিখতে হবে। তোমরা যে ভারত দেখছ, সে ভারত যে নতুন নয় এবং পুরাকালেও যে তার একটা বিরাট ঐতিহ্য ছিল, তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে।

আমি যে কিছুই জানি না আঙ্কল !

ভারত দর্শনের সময়ে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। আমার কাছে তুমি গোড়ার কথাটা জেনে নাও। প্রাচীন ভারতের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু এখন এ দেশে প্রচলিত মাতৃভাষার



সংখ্যা এক হাজার ছশো বাহান্ন। সংবিধানে পনেরোটি প্রধান ভাষা আছে। তার মধ্যে ইংরেজী সরকারী ভাষা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হলেও তার ব্যবহার এখনও উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। প্রধান ভাষাগুলি তুমি তোমার খাতায় টুকে রাখো।

আমি পেনসিল হাতে নিয়ে খাতা খুলতেই ইয়েস সার আঙ্কল বলল : সংস্কৃত, বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, গুজরাতী, মারাঠী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী ও মালয়ালাম। ইংরেজীকে নিয়ে পনের। ভারতীয় সাহিত্য বলতে কোন একটি ভাষার সাহিত্য বোঝায় না। তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সবারই একটা ধারণা থাকা দরকার। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ যে বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের রচনা কাল অনুমান করা যেতে পারে। যে সব মুনি ঋষির নাম এতে পাওয়া যায়, তাঁদের কাল নির্ণয় করে বলা যায় যে বেদ রচনা আরম্ভ হয়েছিল ৩৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পর এবং বেদের বেশির ভাগ রচিত হয়েছিল ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ও তারপরে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই বেদের রচনাগুলি সংগ্রহ করে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ নামে সংকলন করেন। পুরাণগুলিতে এর আগের ঘটনাও পাওয়া যায়, কিন্তু বেদব্যাসই পুরাণের উপাদান সংগ্রহ করে পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। এখন আমরা যে সব পুরাণ পাই, তা খ্রীষ্টের জন্মের পরেই লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। বেদের পর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নামে রচনা এবং সবার পর মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ। পণ্ডিতরা মনে করেন যে রামায়ণ রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। মহাভারত তার একশো বছর পরে, আর পুরাণগুলি কয়েক শো বছর ধরে রচিত হয়েছে। এর পরের কাব্য সাহিত্য ও নাটকের রচনাকাল ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

ইয়েস সার আঙ্কল একটু থেমে বলল : অন্য ভাষার সাহিত্য জানতে হলে সেই সব রাজ্যে গিয়েই জেনে নিতে হবে। চিত্রকলা আরও প্রাচীন। মধ্যভারতের গুহায় প্রস্তর যুগের চিত্রকলা পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকার মাটির নিচে থেকে যে সব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে, তাতেও আছে চিত্রকলার নিদর্শন। বেদে অগ্নির চিত্র চামড়ায় এঁকে উপাসনার কথা আছে। বৌদ্ধ চিত্রকলার আরম্ভ বুদ্ধের সময়েই। বিম্বিসারের একটি চিত্রশালা ছিল। ভারতের

গুহামন্দিরগুলিতে ফ্রেস্কো চিত্রগুলি দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত হয়েছে।

তারপর ?

না, বেশি কথা বললে তুমি মনে রাখতে পারবে না। আমারও বেশি জানা নেই। সংক্ষেপে জানাই ভাল। সিন্ধু উপত্যকার মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে যে সেখানে স্থাপত্যের মান বেশ উন্নত ছিল। পাকিস্তানের মহেঞ্জোদড়ো থেকে গুজরাতের লোথাল পর্যন্ত স্থাপত্যের নমুনা পাওয়া গেছে। তাতে ঘর-বাড়ি, বাজার-হাট, কল-কারখানা, মাটির নীচে পয়ঃপ্রণালী, এমনকি বন্দরের জেটিও পাওয়া গেছে। এর পরবর্তীকালের আর্য বা বৈদিক স্থাপত্য অনেক নিম্ন মানের দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে সিন্ধু সভ্যতা মাটির নিচে চাপা পড়েছিল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়, তারপর আর্য নামের এক যাযাবর কৃষক জাতি এসে এ দেশে বসবাস আরম্ভ করে। তারা নগর নির্মাণের পদ্ধতি জানত না। অযোধ্যার মাটির নিচে রামের আমলের কিছু পাওয়া যায় নি। ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনাপুরেও কুরু পাণ্ডবের ঘর বাড়ি পাওয়া যায় নি। তবে রাজগৃহের প্রাচীর আছে, পাটলিপুত্রে আছে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

বললাম : আমরা তো এসব দেখব।

নিশ্চয় দেখব। নিজের চোখে এই সব দেখবার জন্যেই তো আমরা বের হচ্ছি। মৌর্য ও গুপ্তযুগের শিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দক্ষিণে অমরাবতী থেকে পশ্চিমে গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কোন জাদুঘরে গিয়ে আমরা ভারহুত মথুরা গান্ধার প্রভৃতি শৈলীর নমুনা দেখে তাদের বৈশিষ্ট্য বুঝবার চেষ্টা করব।

ইয়েস সার আঙ্কল একটু দম নিয়ে বলল : এর পর সঙ্গীত ও নৃত্যের কথা। ভারতীয় সঙ্গীতের জন্ম কবে তা জানা যায় না, তবে বেদের ঋষিরা যে সাত সুরে বেদ পাঠ করতেন তা জানা যায়। তার আগে নাকি চার সুরে গান হত। সামবেদের মন্ত্র গান করা হত, তার নাম সামগান। শুনে আশ্চর্য হবে যে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারশো বছর আগে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। এর পরে রচিত আরও অনেক গ্রন্থে সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকের কথা আছে। ভারতীয় সঙ্গীতে এখন প্রধান দুটি ভাগ—একটি উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীত, অপরটি হল দক্ষিণ ভারতের

কর্ণাটকী সঙ্গীত। এ ছাড়া আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতও অনেক রকমের। পুরাণে আমরা পাই যে দেবতারাও গান জানতেন। শিব শুধু গান নয় নাচও জানতেন। তিনি ছিলেন নটরাজ। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন। গন্ধর্বরা গাইত ইন্দ্রের সভায়, আর নাচত অপ্সরা। এরাও মানুষ ছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয়। তাই ভারতের অনেক মন্দিরেই নাচ গানের ব্যবস্থা ছিল। গানের সঙ্গে দেবদাসীরা নাচত মন্দিরে।

বললাম : শুনেছি যে পৃথিবী ধ্বংস করবার জন্যে শিব তাণ্ডব নৃত্য করতেন।

ইয়েস সার আঙ্কল সঙ্গে সঙ্গে বলল : আর অন্য সময়ে লাস্য নৃত্য। তিনি যখন তপস্যা করছিলেন, তখন পার্বতীও তপস্যা করে ও নেচে তাঁর মন জয় করেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ নৃত্যই মন্দিরের নাচ, দেবতার সামনে নাচতে হয়। উত্তর ভারতের কথক নৃত্য মন্দির থেকেই রাজসভায় এসেছিল। ওড়িষী কুচিপুড়ি ও ভরতনাট্টম কতকটা একই রকমের নৃত্য, মন্দিরে দেবদাসীরা নাচত। কেরালার কথাকলিও পৌরাণিক নৃত্য। আর মণিপুরের রাসও ধর্মীয় নৃত্য। এ ছাড়া নানা রকমের আঞ্চলিক নৃত্যও আছে। আদিবাসীদের নাচও সুন্দর। উৎসবের সময়ে সে সব নাচ হয়। সবাই নাচে।

ভৌ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার ধারে ছুটে গেল, তারপর সামনের পা তুলে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল। পরক্ষণেই ডেকে উঠল ভৌ ভৌ করে।

ইয়েস সার আঙ্কল গম্ভীর হয়ে বলল : হিরোশির গাড়ির হর্ণ শুনতে পেয়েছে।

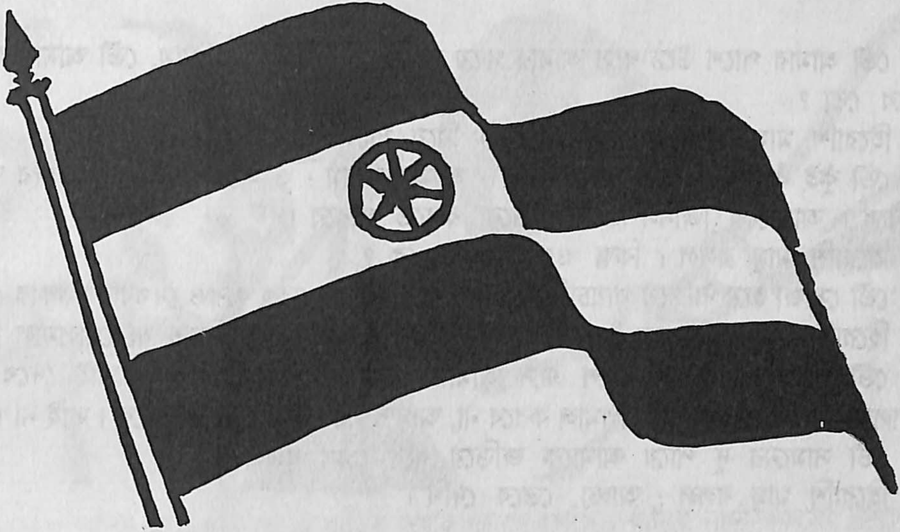
ভৌ ফিরে এসেই আমার গায়ে মুখ ঘষতে লাগল। ইয়েস সার আঙ্কল তাকে বলল : যা দেখে আয়, হিরোশি এসেছে কিনা।

ভৌ উত্তর দিল : ভৌ ভৌ।

এসেছে ! তবে আজ এই পর্যন্তই থাক। টা-টা।

বলে ইয়েস সার আঙ্কল আমাকে বিদায় দিল।

হিরোশি মামু আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছিল, চা খেতে খেতে বলল : তোমার সব কিছু রেডি তো ! আমরা কিন্তু যে কোন দিন বেরিয়ে পড়ব।



আমি বললাম : ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নিয়েছি।

হিরোশি মামু বলল : বেশ। আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি। আমাদের জাতীয় পতাকা আর রাষ্ট্রীয় প্রতীক কী রকম বল।

আমাকে ভাবতে দেখে হিরোশি মামু নিজেই বলল : জাতীয় পতাকা তিন রঙের পতাকা—উপরে গেরুয়া, নিচে সবুজ, মাঝখানে সাদা। তার ওপর নীল রঙের চক্র। বৈরাগ্য, শান্তি ও সজীবতার প্রতীক। প্রতীক চিহ্নটি নেওয়া হয়েছে অশোকের স্তম্ভ থেকে। তাঁর নিচে মাণ্ডুক্য উপনিষদের বাণী—সত্যমের জয়তে অর্থাৎ সত্যেরই জয় হয়। রবীন্দ্রনাথের 'জন গণ মন' যে জাতীয় সঙ্গীত তা জানো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' কে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। জাতীয় পঞ্জিকার কথাও মনে রাখবে। ১৯৫৭ সাল থেকে শকাব্দ দিয়ে ক্যালেণ্ডার সারা ভারতে প্রচলিত হয়েছে। এতে বাইশে মার্চ পয়লা চৈত্র, লিপ ইয়ারে একুশে মার্চ। কিন্তু আমরা পুরনো ক্যালেণ্ডার ধরেই চলছি।

তারপর আমাকে বলল : এইবারে তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে কর। আমি উত্তর দেব।

ভৌ আমার পাশে উঠে বসে আমার গায়ে মুখ ঘষতেই বললাম : মামু, ভৌ আমাদের সঙ্গে যাবে তো ?

হিরোশি মামু তৎক্ষণাৎ বলল : ওকে নিয়ে যাবে কিসের জন্যে !

ভৌ কুঁই কুঁই করে যেন কেঁদে উঠল। আমি বললাম : ও সঙ্গে থাকলে আমাদের অনেক সুবিধে। আমাদের জিনিসপত্র দেখাশুনো করতে পারবে।

হিরোশি মামু বলল : কিন্তু ওকে দেখবে কে ?

ভৌ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পায়চারি করে দেখিয়ে দিল যে ওকে কারও দেখবার দরকার নেই।

হিরোশি মামু তবু বলল : ওকে স্নান করানো, খাওয়ানো—বাড়িতে যা গোলমাল করে !

ভৌ তৎক্ষণাৎ আমার পাশে এসে আমার গায়ে মুখ ঘষতে লাগল। তাই দেখে আমি বললাম : ও আর একটুও গোলমাল করবে না, আমার সঙ্গে স্নান খাওয়া করবে। তাই না ভৌ ?

ভৌ সামনের দু পায়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজল।

হিরোশি মামু বলল : আচ্ছা, ভেবে দেখি।

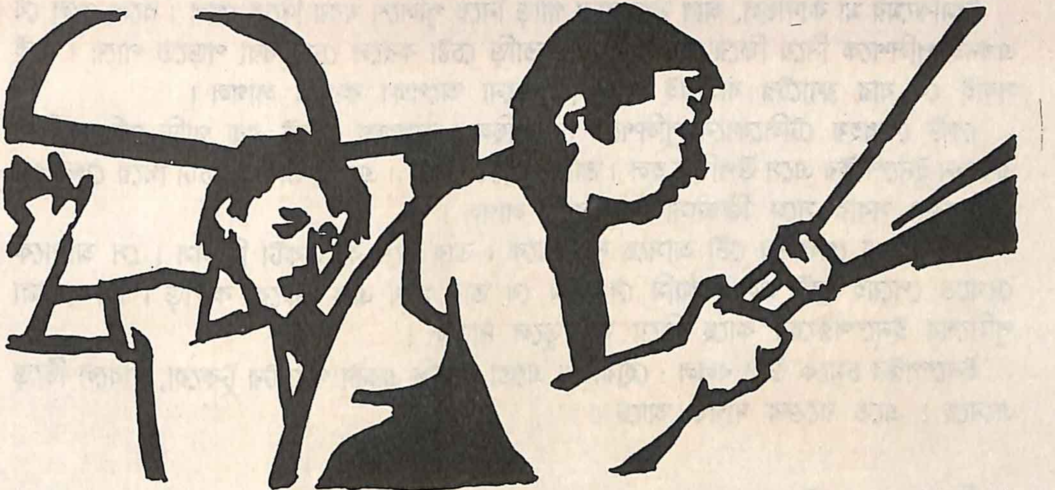
সেই রাতেই ঘটল ঘটনাটা, ফলে হিরোশি মামুর রাজী না হয়ে আর উপায় রইল না। হৈচৈ চাচা আর ইয়েস সার আঙ্কলও আমাকে সমর্থন করল ভীষণ ভাবে।

রাতে ভৌ আজকাল আমার খাটের তলায় শোয়। তখন রাত কত হবে জানি না। ভৌ-এর ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বোধহয় লোড শেডিং, কিংবা পাওয়ার ফেইলিওর। মোট কথা যে বাতিটা রোজ রাতে জ্বলে, সেটা জ্বলছে না। অথচ ভৌ বাইরে বেরোবার জন্যে চেঁচাচ্ছে। আমাকে জাগতে দেখেই সে ছুটে গিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে দিতে বলল। আমি তাই করতেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল। দিদা বোধহয় দরজা খোলার শব্দ পেয়েছিলেন। বললেন : দরজাটা বন্ধ করে দিও দাদু, দরজা খোলা রেখো না।

কিন্তু ভৌ ফিরবে কেমন করে !

ও ফিরে এলে ডাকাডাকি করবে।

আমি তাই দরজাটা আবার বন্ধ করে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।



কিছুক্ষণ পরেই মনে হল যে এ বাড়ির সবাই জেগে গেছে। বাইরে নানা রকমের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে চেঁচামেচিও। হিরোশি মামুরও ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বলল : এত গোলমাল কিসের ?

দিদা বললেন : ভৌ বেরিয়ে গেছে।

ভৌ বেরিয়ে গেছে !

বলে হিরোশি মামু টর্চ হাতে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। তার পিছনে আমিও গেলাম। জানতে পারলাম যে চোর এসেছিল কয়েকটা। তারাই নাকি মেন সুইচের ফিউজ খুলে সমস্ত অন্ধকার করে দিয়েছে। বাতি জ্বালানোর চেষ্টা চলছে। তখন বোঝা যাবে কোনও ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে কিনা।

একটু পরেই বাতি জ্বলল এবং জানা গেল যে চুরি হয়েছে রিমঝিমদের ফ্ল্যাটে। অ্যামেরিকা থেকে তারা অনেক নতুন জিনিস এনেছিল, সে সবই চুরি হয়েছে। আরও দু একটা ফ্ল্যাটে চোররা ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বোধহয় পারে নি।

রিমঝিমের মা কাঁদছিল, আর তার বাবা গাড়ি নিয়ে পুলিশে খবর দিতে গেল। বলে গেল যে এখনই পুলিশকে নিয়ে ফিরে আসবে। তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলে চোর ধরা পড়তে পারে। তাই সবাই যে যার ফ্ল্যাটের বাইরেই পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ বোধহয় টেলিফোনে পুলিশকে ডেকেছিল। অল্পক্ষণ পরেই এক গাড়ি পুলিশ নিয়ে একজন ইন্‌স্পেক্টর এসে উপস্থিত হল। তাদের হাতে বন্দুক। এসেই তারা নিচেটা ঘিরে ফেলল। ইন্‌স্পেক্টর সবার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল যে ভৌ আসছে দূর থেকে। তার মুখে কী একটা জিনিস। সে আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। আমি দেখলাম যে তার মুখে এক টুকরো কাপড়। সে সোজা পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরের কাছে গিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াল।

ইন্‌স্পেক্টর চমকে উঠে বলল : হোয়াট্‌ ! এতো দেখছি একটা প্যান্টের টুকরো, খাবলে ছিড়ে এনেছে ! এতে রক্তের দাগও আছে !

দিনের বেলাতেই জানা গেল যে চোর ধরা পড়েছে দলশুদ্ধ। ভৌ যে চোরটার পা কামড়ে ধরে প্যান্ট ছিড়ে নিয়েছে, সে-ই ধরা পড়েছিল আগে। পুলিশ ভৌকে কী পুরস্কার দেবে ভাবছে, আর অফিস থেকে ফিরে হিরোশি মামু বলল : ভৌ আমাদের সঙ্গে যাবে গোপাল। তার জন্যে দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিও।

ভৌ আমার কাঁধের ওপরে তার সামনের দু পা তুলে দিয়ে নাচতে লাগল।



'ছোটদের রম্যাণি বীক্ষ্য' ছোটদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এবং ছোটদের মনের মতো ভাষায়, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক স্মরণীয় সৃষ্টি। এই সুপরিকল্পিত গ্রন্থমালায় ভারত ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে খণ্ডে খণ্ডে, ইতিহাসের গুরুত্ব অনুসারে। প্রথম খণ্ডের নাম, ভারত। আর এটিই সমগ্র গ্রন্থমালার ভূমিকা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই গ্রন্থমালা ছোটদের জন্যে এক নতুন মহাভারত।

